পরিবেশ শিক্ষা

একাদশ শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক

('দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' এবং 'পথ সুরক্ষা' সংযোজিত)

অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি-২১

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০১২
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২০১৪
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ২০১৬
(পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)

© অসম উচ্চতর মাধ্যমিক
শিক্ষা সংসদ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি-২১

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

প্রচ্ছদ ঃ খাইৰুল বাচাৰ

**অসম উচ্চতর মাধ্যমিক
শিক্ষা সংসদের সচিবের
দ্বারা প্রকাশিত
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি- ৭৮১০২১**

মুদ্রক ঃ
শরাইঘাট ফটো টাইপছ প্রাঃ লিঃ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি-২১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

- প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার যে কোনো অংশ ছাপা অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যম, যান্ত্রিক মাধ্যম, ফটো প্রতিলিপি, রেকর্ডিং অথবা অন্য কোনো উপায়ে পুনঃপদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ অথবা সংবর্ধন নিষিদ্ধ।
- চুক্তি অনুযায়ী প্রকাশকের আগাম অনুমতি ছাড়া এই পুস্তক তার নিজস্ব প্রচ্ছদ এবং বাইন্ডিং ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যবসা করা, ভাড়া দেওয়া, পুনরায় বিক্রি অথবা ধারে দেওয়া যাবে না।
- এই পুস্তকের উচিত মূল্য এই পৃষ্ঠায় ছাপতে হবে। রাবার স্টাম্প, স্টিকার মারা বা অন্য কোনো প্রকারে অঙ্কিত যে কোনো সংশোধিত মূল্যই অশুদ্ধ হবে এবং বিবেচিত হবে না।

**অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষে
অসম বুক হাইভ
পাণবজার, গুয়াহাটি-৭৮১০০১**

ভূমিকা

অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশ অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পরিবেশ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও জনচেনতা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে 'পরিবেশ শিক্ষা' নামে একটি নতুন বিষয় উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পরবর্তী নির্দেশমতে এই পাঠ্যক্রমে "পথ সুরক্ষা" এবং "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দুটি নতুন অংশ এই পরিবেশ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে বিষয় দুটির গুরুত্ব অনুধাবন করে অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সিদ্ধান্তমর্মে এই দুটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করে 'পরিবেশ শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি নতুন রূপে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল।

কোনো অনাকাঙ্খিত ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজ বা পাঠ্যক্রমটির সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো ব্যক্তি সেই বিষয়টি সংসদকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সেটি সংশোধন করার আশ্বাস দেওয়া হ'ল।

সবশেষে এই পাঠ্যক্রমটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে এবং এটির সফল রূপায়নে অংশীদার হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হ'ল।

বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি

শ্রী সোনমণি দাস
সচিব
অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি-২১

লেখক

পরিবেশ শিক্ষা ঃ প্রথম ভাগ

লেখক ঃ ড° হরিপ্রসাদ শর্মা
রেক্টর, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ দ্বিতীয় ভাগ

লেখক ঃ শ্রী হীরেন নাথ, IPS
আরক্ষী মহাপরিদর্শক (বিশেষ শাখা)
(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রশিক্ষনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট
ও এই বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত লেখক)

পথ সুরক্ষা ঃ তৃতীয় ভাগ

লেখক ঃ শ্রী দ্বিজেন দাস
অবসরপ্রাপ্ত জেলা পরিবহন আধিকারিক অসম চরকার
(পথ সুরক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন কর্মশালার অভিজ্ঞতাপুষ্ট লেখক)

বাংলা অনুবাদ ঃ ড° মৌসুমী গাঙ্গুলী
সহযোগী অধ্যাপিকা, কটন কলেজ, গুয়াহাটি

সমন্বয়ক ঃ অনুরূপা চৌধুরী
উপ সচিব (শৈক্ষিক)
অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্রকল্প

মোট নম্বর ১০

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে কোনো শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের হাতে জমা দিতে হবে। প্রকল্পের জন্য ধার্য করা মোট ১০ নম্বর চূড়ান্ত পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে।

ছাত্র-ছাত্রীরা নীচে দেওয়া বিষয়গুলির যে কোনো একটি বিষয়ে অথবা শিক্ষক/শিক্ষয়ত্রীর তত্ত্বাবধানে এই বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোনো বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তুত করবে।

(ক) স্থানীয় কোনো এলাকায় গিয়ে সেখানের পরিবেশগত সম্পদ যেমন নদী/অরণ্য/তৃণভূমি/কৃষিভূমি/পাহাড় আদির তথ্য নথিভুক্ত কর।

(খ) প্রদূষিত অঞ্চল যেমন নগরাঞ্চল, গ্রামাঞ্চল, শিল্পক্ষেত্র ইত্যাদি ভ্রমণ করে একটি বিবরণ লেখ।

(গ) তোমার বাসস্থান বা শিক্ষানুষ্ঠানের কাছে কোনো এক ধরনের উদ্ভিদ/কীট-পতঙ্গ/পাখি/জন্তু তিনমাস সময় পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে সেগুলির পরিবর্তন, গতিবিধি, পরিবেশের উপরে প্রভাব ইত্যাদির দিনপঞ্জি-ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত কর।

(ঘ) গরমের ছুটিতে কোনো একটি বিশেষ স্থান ভ্রমণ করে সেখানের প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ নির্ভর অর্থনীতি, পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার সামাজিক সমস্যা ইত্যাদির উপর একটি প্রতিবেদন দাখিল কর।

(ঙ) দুর্যোগের সময়ে ব্যবহার করার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার একটি বাক্স (First Aid Box) প্রস্তুত কর।

(চ) জরুরি সেবা সম্বলিত যেমন— পুলিশ থানা, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী, চিকিৎসালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যালয়, পৌরনিগম, উপায়ুক্তের কার্যালয়, খণ্ড-প্রাধিকারীর কার্যালয় ইত্যাদির ফোন নম্বর ও ঠিকানাসহ একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

(ছ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হওয়া তোমার নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলে গিয়ে দুর্যোগের কারণ, পরিণতি, পুনরুদ্ধারের জন্য নেওয়া ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে দুর্যোগ নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদির উপরে তথ্যযুক্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

(জ) যান-বাহন আইন অনুযায়ী রাস্তাঘাটে ব্যবহৃত বাধ্যতামূলক/সতর্কতামূলক পথচিহ্নের একটি ছবিসহ তালিকা প্রস্তুত কর।

(ঝ) তোমার শিক্ষানুষ্ঠানটিকে প্রদূষণমুক্ত ও সুস্থ পরিবেশযুক্ত করে রাখতে চারদিকের যান-বাহনের গতিবিধি এবং প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনের বিবরণ দাও।

(ঞ) বিদ্যালয়ে পরিবেশের প্রতি সজাগ ও দায়িত্বশীল সংগঠন (Eco club) গঠন করে পরিবেশ সম্পর্কীয় কার্যসূচী রূপায়ণ/বিশ্ব পরিবেশ দিবস/পথ সুরক্ষা সপ্তাহ/রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রশমন দিবস (২৯ অক্টোবর) ইত্যাদি পালন কর।

নম্বর বিভাজন

মোট নম্বর-৫০

লিখিত পরীক্ষার (বা তত্ত্ব) জন্য নম্বর ঃ			৪০
প্রথম ভাগ	ঃ	পরিবেশ শিক্ষা	
		মূল্যাংক ঃ	২০
দ্বিতীয় ভাগ	ঃ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	
		মূল্যাংক ঃ	১০
তৃতীয় ভাগ	ঃ	পথ সুরক্ষা	
		মূল্যাংক ঃ	১০
		প্রকল্প	
		মূল্যাংক ঃ	১০

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ ঃ পরিবেশ শিক্ষা

প্রথম অধ্যায় ঃ পরিবেশ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ১-৯

পরিবেশের বিভিন্ন অংশ বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং জীবমণ্ডল, পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা-নীতিমালা এবং বিবিধ বিষয়ক চরিত্র। পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতার আবশ্যকতা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাস্তব্যবিদ্যা-সংক্রান্ত ধারণা ১০-২০

বাস্তব্যবিদ্যা এবং পরিস্থিতিতন্ত্রের সংজ্ঞা, গঠন এবং কার্যাবলি, খাদ্য শৃঙ্খল, খাদ্যজাল ও পৌষ্টিক স্তর, বাস্তব্যবিদ্যা পিরামিড

তৃতীয় অধ্যায় ঃ জৈব বৈচিত্র্য এবং তার সংরক্ষণ ২১-৩০

জৈব বৈচিত্র্য, বংশগতি, প্রজাতি ও পরিস্থিতিতন্ত্র জৈব বৈচিত্র্য, জৈব বৈচিত্র্যের মূল্য— ব্যবহারিক, উৎপাদনকারী, সামাজিক, নৈতিক, নৈসর্গিক এবং বৈকল্পিক জৈব বৈচিত্র্যের প্রতি সতর্কতা, জৈব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ৩১-৩৮

প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা, বিভিন্ন প্রকার, পুণর্ব্যবহারযোগ্য এবং পুনর্ব্যবহার অযোগ্য সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ উল্লেখসহ ভারতের খনিজ, বনজ এবং জলজ সম্পদসমূহ।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ পরিবেশ প্রদূষণ ৩৯-৬৪

সংজ্ঞা, প্রদূষণের বিভিন্ন প্রকার, বায়ু, জল, মাটি, শব্দ, কঠিন আবর্জনা প্রদূষণএর কারণ এবং ফলাফল।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সামাজিক বিষয়সমূহ ও পরিবেশ ৬৫-৭৬

বহনক্ষম উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা, শক্তির ব্যবহার ও সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, সবুজ গৃহ প্রভাব ও গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, অ্যাসিড বৃষ্টি।

দ্বিতীয় ভাগ ৭৭-৯০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ দায়িত্ব ও সাবধানতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, ভারতবর্ষের ভয়াবহ দুর্যোগসমূহ, ভারতবর্ষের খনি দুর্ঘটনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ছাত্র-ছাত্রীর ভূমিকা, ভারতবর্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অসম রাজ্যিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাধিকরণ, অসম রাজ্যিক দুর্যোগ প্রতিরোধ বাহিনী।

তৃতীয় ভাগ ৯১-১১২

পথ সুরক্ষা ঃ পথ সুরক্ষা বলতে কি বোঝায়? পথ দুর্ঘটনার কারণ, পথ সুরক্ষা কর্মসূচী, পথ দুর্ঘটনার কিছু ভয়াবহ পরিসংখ্যা, পথ বিধান, ধোঁয়া প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রমাণ পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, যান বাহন আইনসমূহ, ট্রাফিক লাইট, পথ চিহ্ন।

প্রথম অধ্যায়
পরিবেশ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

পরিবেশ

পরিবেশ (এনভায়রনমেণ্ট) শব্দের অর্থ হল পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এনভায়রনমেণ্ট শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ফরাসি 'এনভায়রনার' (আশ-পাশের চারদিক নিয়ে বা নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলীকৃত এক নির্দিষ্ট এলাকা— to encircle or to surround শব্দ থেকে। এটা হচ্ছে প্রাণী এবং উদ্ভিদের বসবাসযোগ্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গঠিত এক অবস্থার পর্যালোচনা। যেখানে জীবিত প্রাণী এবং উদ্ভিদসমূহের বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম এবং জীবনধারণ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রসদ— যেমন বায়ু, জল, মাটি এবং সূর্যের রশ্মি ইত্যাদি সমস্ত উপাদান রয়েছে। পরিবেশে আরও কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইগুলো হচ্ছে, তাপ, বায়ু, শক্তি (এনার্জি) ইত্যাদি। এইভাবে জৈব এবং অজৈব সমস্ত উপাদান নিয়েই গঠিত হয়েছে পরিবেশ। পরিবেশ জীবিত বস্তুসমূহের সৃষ্টি করে।

পরিবেশকে কয়েকটি উপায়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব—

১। প্রথম ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেখানে এই ধরণের পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থা বা অবস্থার দ্বারা প্রাণী এবং উদ্ভিদের একটি গোষ্ঠী পরিবৃত রয়েছে।

২। মানুষের চতুর্দিক গঠন করা সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক, ভৌতিক অথবা রাসায়নিক কারকসমূহের সমষ্টি হচ্ছে পরিবেশ। মানুষই হচ্ছে তাদের পরিবেশ স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা।

পরিবেশের উপাদানসমূহ ঃ

১। অজৈবিক উপাদান

২। জৈবিক উপাদান

৩। শক্তি উপাদান

অজৈবিক অথবা ভৌতিক পরিবেশকে তিনটি শ্রেণিতে উপবিভাজন করা যায়—

১। ভূমণ্ডল (কঠিন)

২। জলমণ্ডল (তরল)

৩। বায়ুমণ্ডল (গ্যাস)

জৈবিক উপাদানসমূহ মানব জাতি সহ উদ্ভিদ এবং প্রাণীকূলকে নিয়ে গঠিত।

শক্তি উপাদানসমূহ হচ্ছে, সৌরশক্তি, ভূতাপ শক্তি, জল বৈদ্যুতিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি।

পরিবেশের অংশসমূহ ঃ

১। এটমোস্ফিয়ার বা বায়ুমণ্ডল

২। হাইড্রোস্ফিয়ার বা জলমণ্ডল

৩। লিথোস্ফিয়ার বা ভূস্তরীয় মণ্ডল

৪। বায়োস্ফিয়ার বা জীবমণ্ডল

১। এটমোস্ফিয়ার বা বায়ুমণ্ডল ঃ

সৌরজগতে পৃথিবী হচ্ছে একমাত্র গ্রহ যেখানে জীবন বা প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। আমাদের গ্রহে প্রাণের অনুকূল এই উপাদানসমূহ আছে অভিনব বায়ুমণ্ডল বা বাতাবরণের জন্যই। প্রাণীকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম এক গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে চারদিক থেকে পরিবৃত করে রেখেছে, যা মহাকাশের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে প্রাণীকূলকে রক্ষা

করছে। পৃথিবীর বহির্ভাগের মহাকাশ থেকে আসা বেশিভাগ মহাজাগতিক রশ্মি এবং সূর্য থেকে আসা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিরণকে শুষে নেয় পৃথিবীর গ্যাসীয় আবরণ। এই গ্যাসীয় আবরণ আমাদের শরীরের কোষ ধ্বংসকারী অতিবেগুনি রশ্মির কণা থেকে রক্ষা করে।

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীতে সূর্য থেকে বিকিরিত হয়ে আসা এবং পৃথিবী থেকে পুনরায় বিকিরিত অবলোহিত রশ্মিকে শুষে নিয়ে তাপের ভারসাম্য রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বায়ুমণ্ডলের গঠন ঃ

প্রধান উপাদান ঃ নাইট্রোজেন, N_2 (৭৮.০৯%)

অক্সিজেন, O_2 (২০.৯৪%)

লঘু উপাদান ঃ আর্গন, Ar (৯.৩৪×১০^{-১}%)

কার্বন ডাই-অক্সাইড CO_2 (৩.২৫×১০^{-২}%)

অন্য নগণ্য পরিমাণের গ্যাস ঃ নিয়ন, হিলিয়াম, মিথেন, জলীয় বাষ্প, ক্রিপটন, নাইট্রাস অক্সাইড, জেনন, হাইড্রোজেন, সালফার ডাই-অক্সাইড, ওজোন, এমনিয়া, কার্বন মনক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি।

পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল হচ্ছে জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেনের উৎস। বায়ুমণ্ডল উদ্ভিদে সংঘটিত সালোক সংশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য কার্বন ডাই-অক্সাইডেরও উৎস। প্রাণীর জন্য অত্যাবশ্যক তথা রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত প্রটিনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনও এই বায়ুমণ্ডলেই বর্তমান।

সামগ্রিকভাবে বায়ুমণ্ডলকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

স্তর	উচ্চতার পর্যায় কি.মি.	উত্তাপের পর্যায় ^0c	গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান
ট্রপোস্ফিয়ার	০-১১	১৫ থেকে-৫৬	N_2 O_2 CO_2 H_2O
স্ট্রেটোস্ফিয়ার	১১-৫০	-৫৬ থেকে -২	O_2
মেসোস্ফিয়ার	৫০-৮৫	-২ থেকে -৯২	O^+_2, NO^+
থার্মোস্ফিয়ার	৮৫-৫০০	-৯২ থেকে ১২০০	O^+_2, O^+, NO^+

ওজোন গ্যাস ছড়িয়ে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের স্ট্রেটোস্ফিয়ার অঞ্চলে। এই ওজোন গ্যাস আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পৃথিবীর জীবনের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে ওজোন গ্যাস।

২। হাইড্রোস্ফিয়ার (জলমণ্ডল) ঃ

হাইড্রোস্ফিয়ার বা জলমণ্ডলে সমস্ত ধরণের জলসম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন— মহাসাগর, সাগর, নদ-নদী, হ্রদ, জলধার, হিমবাহ, মেরু অঞ্চলের তুষারস্তর এবং ভূগর্ভস্থ জল (ভূস্তরের তলায় সঞ্চিত জল)। পৃথিবীর অধিকাংশই জল পরিবৃত। পৃথিবীর ভূভাগের ৭১ শতাংশ অর্থাৎ মোট ১৪০০ নিযুত কিউবিক কিলোমিটার জল পরিবৃত। তা সত্ত্বেও বহু স্থানে এখনও যথার্থ গুণগত মানের জল প্রত্যাশিত পরিমাণে পাওয়া কঠিন। পৃথিবীর জলের ৯৭ শতাংশ রয়েছে মহাসাগরসমূহে, কিন্তু এই জল লবনযুক্ত। মাত্র ৩ শতাংশ জল হচ্ছে নির্মল তথা ব্যবহারযোগ্য জল। এই ৩ শতাংশ নির্মল জলের ৭৯ শতাংশ রয়েছে মেরু অঞ্চলের তুষার আবরণ এবং হিমবাহসমূহে। অন্যদিকে ২০ শতাংশ জল আবদ্ধ হয়ে রয়েছে ভূগর্ভের তলায়। মাত্র ১ শতাংশ জল পাওয়া যায় মানুষের ব্যবহারের উপযোগী হিসেবে (এই জল শুধু পাওয়া যায় নদ-নদী, হ্রদ, ঝরনা, এবং অন্যান্য জলাধারে)।

৩। লিথোস্ফিয়ার (ভূমণ্ডল) ঃ

এই মণ্ডল হচ্ছে খনিজ দ্রব্য এবং মাটির দ্বারা গঠিত কঠিন পৃথিৱীর উপরের স্তর (Outer mantle)। মাটি হচ্ছে খনিজ উপাদান, জৈবিক বস্তু

(Organic mantle) বায়ু এবং জলের জটিল সংমিশ্রণে গঠিত আবরণ। ভূমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মাটি। মাটি হচ্ছে খনিজ সামগ্রীর সংগ্রহালয়, জলের আধার, উর্বরতার সংরক্ষক, শস্য উৎপাদক এবং বন্যপ্রাণী তথা পশুসম্পদের গৃহভূমি।

৪। বায়োস্ফিয়ার (জীবমণ্ডল) ঃ

বায়োস্ফিয়ার হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের ওপরের স্তর যেখানে জীবকূল বেঁচে থাকতে পারে। জীবমণ্ডলের এই স্তর বায়ুমণ্ডলের ৬-৮ কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত এবং সমুদ্রের ৮-১০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরেই জীবন্ত জীবসমূহের বাস এবং পরিবেশের সঙ্গে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কের সমস্ত দিক প্রকাশ করে থাকে তারা।

পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ঃ

একটা সময় ছিল, যখন আমাদের চারপাশের সমস্ত বস্তু ছিল বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ। বায়ু, জল এবং মাটি ছিল ভারসাম্যমূলক অবস্থায়। প্রকৃতি স্বয়ং ছিল যথেষ্ট উপভোগ্য। আদিম যুগে মানুষের চাহিদা ছিল সীমিত। তাই মানুষের চাহিদা প্রকৃতির সঙ্গে থাকা সামঞ্জস্যকে আঘাত করতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে বহুগুণ। দ্রুতভাবে সংঘটিত হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি। এর ফলে শুরু হয় প্রকৃতির অবক্ষয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনধারণের চেষ্টা শুরু হল। কোনো ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই বন ধ্বংস শুরু করল প্রকৃতিকে নির্দয়ভাবে সংহারের কাজ। আজ আমরা যে বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি, যে জল পান করি তা বিশুদ্ধ নয় এবং মোটেই নিরাপদ নয়। গত কয়েক দশক ধরে সারা বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যাদি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। মানুষ আজ পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সচেতন হয়ে উঠছে। মানুষের পরিকল্পনাবিহীন কার্যকলাপের ফলে প্রকৃতির মূল্যবান সম্পদসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের শিক্ষাবিদ এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বারবার বলে আসছেন, পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা এবং এই সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি অথবা জ্ঞান। পরিবেশ শিক্ষাই হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়ের উত্তর।

সুস্থ মনোভাব তৈরি, দক্ষতা অর্জন এবং জ্ঞানের বিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষা সময়সময় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণে ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সম্পর্কিত স্টকহোম সম্মেলনে পরিবেশকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এটা কোনো নতুন বিষয় নয় এবং তাকে নতুন বিষয় হিসাবে গণ্য করাও উচিত নয়। বরং এটাকে শিক্ষা ব্যবস্থার এক নতুন মাত্রা বা বিস্তার হিসাবে (dimension) গণ্য করা উচিত।

সংক্ষেপে এই বিষয়টিকে পরিবেশ শিক্ষা বলা যায়— যে শিক্ষা হচ্ছে পরিবেশের মাধ্যমে, পরিবেশ বিষয়ে এবং পরিবেশের জন্য গ্রহণ করা শিক্ষা।

পরিবেশ শিক্ষা হচ্ছে এমন এক শিক্ষাগত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে তাদের প্রকৃতি এবং মানুষের সৃষ্ট পরিবেশ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয়। এর অন্তর্গত হচ্ছে জনসংখ্যার সম্পর্ক, প্রদূষণ, সম্পদ বণ্টন এবং নিঃশেষ (ক্ষয়), সংরক্ষণ, পরিবহন প্রযুক্তি এবং সমগ্র মানব পরিবেশের জন্য শহরাঞ্চল এবং গ্রামীণ পরিকল্পনা। পরিবেশ শিক্ষা হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে আন্তর্সম্পর্ক, তাদের সংস্কৃতি, তাদের জৈব-ভৌতিক পারিপার্শ্বিকতাকে উপলব্ধি করা এবং মর্মবস্তুকে বোঝার জন্য দক্ষতা অর্জন, মনোভাব গঠনের লক্ষ্যে মূলবোধকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

১৯৭৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলিসিতে(বর্তমানে জর্জিয়ার রাজধানী) প্রথম বারের মতো পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ে এক বিস্তৃত নীতি-

নির্দেশিকা সন্নিবিষ্ট করা হয়। উক্ত সম্মেলনের ঘোষণা-পত্র পরিবেশ শিক্ষা নিম্নোক্ত ধরনে হতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ঃ

- শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের আন্তর্সম্পর্ককে গুরুত্ব।
- সামগ্রিকভাবে পরিবেশকে বিবেচনা করা।
- নিরন্তর শিক্ষা— প্রাক স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে সমস্ত আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক পর্যায় জুড়ে অব্যাহত রাখা।
- স্থানীয়, আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সমালোচনামূলক দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা করা।
- বর্তমান এবং ভবিষ্যতে পরিবেশের প্রবণতা এবং অবস্থার বিষয়ে অধ্যয়ন চালানো।
- পরিবেশের সমস্যা সৃষ্টির প্রকৃত কারণসমূহ এবং উপসর্গগুলো আবিষ্কার করতে ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা করা এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করা।
- চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিবেশ সমস্যার সমাধানের জন্য স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য গুরুত্ব প্রদান করা।

পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কিত লক্ষ্য এবং নীতি-নির্দেশনাসমূহ হচ্ছে ঃ

১। পরিবেশ এবং পরিবেশের প্রত্যাহ্বানসমূহের প্রতি অনুভূতিশীলতা এবং সচেতনতা।

২। পরিবেশ এবং পরিবেশের প্রত্যাহ্বানসমূহের বিষয়ে উপলব্ধি এবং জ্ঞান অর্জন করা।

৩। পরিবেশের জন্য উদ্বেগের মনোভাব এবং পরিবেশগত গুণমান রক্ষা এবং উন্নত করার মানসিকতা।

৪। পরিবেশগত প্রত্যাহ্বানসমূহের সমাধানে সহায়তা করা এবং সেগুলো চিহ্নিত করার দক্ষতা।

৫। পরিবেশগত প্রত্যাহ্বানসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে শুরু করা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।

বহুমুখী বিষয়ের চরিত্র (Multidisciplimary nature)

পরিবেশ শিক্ষা হচ্ছে বহুমুখী বিষয়। পরিবেশ এবং তার বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, জৈব অভিযন্ত্রবিদ্যা (বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং), অণুজীবতত্ত্ব, জিনতত্ত্ব, জৈব-রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জৈবিক (বায়োটেক) উপাদানসমূহ এবং সেগুলোর আন্তঃক্রিয়া সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যাবিদ্যা ইত্যাদি পরিবেশের বিভিন্ন পরিঘটনা (phenomena)সমূহ বুঝতে সাহায্য করে। কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি হচ্ছে পরিবেশ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। একইভাবে প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ অভিযন্ত্রবিদ্যা (ইঞ্জিনিয়ারিং) অত্যাবশ্যক। অভিযান্ত্রিক বিদ্যার অন্যান্য শাখাসমূহ, যেমন রসায়ন (Chemical), অসামরিক (Civil) কারিগরি (Mechanical) এবং নতুন উদ্ভাবনমূলক প্রযুক্তিগুলোও পরিবেশ সুরক্ষার কাজে যুক্ত। ধ্বংসপথে অগ্রসর হওয়া পরিবেশকে সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে সবুজ রসায়ন বিদ্যা (green chemistry) একটি সুনির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভূমিকা পালন করে। সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ও বিভিন্নভাবে যুক্ত। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বলবৎ করা হয়ে থাকে পরিবেশ আইন। তাই পরিবেশ শিক্ষা তার বহুমুখী চরিত্র নিয়ে এক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিভিন্ন দিকের মোকাবিলা করে থাকে।

পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা ঃ

বিশ্বকে আজ পরিবেশ অবক্ষয় এবং প্রদূষণের মতো বৃহৎ সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের প্রদূষণ, বনজ সম্পদের দ্রুত ক্ষয়,

দ্রুত হারে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, ঔদ্যোগীকরণের প্রসার, অপরিকল্পিতভারে নগরায়ন, খনির কাজ, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবেশতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানুষের অনুসন্ধানই মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ নির্দয়ভাবে ব্যবহারের জন্য দায়ী। এছাড়াও মানবজাতির বস্তুবাদী, লোভী এবং বিলাসী জীবন যাপনের মনোভাব প্রাকৃতিক সম্পদকে বাছবিচারহীনভাবে শোষণ করছে বা নির্দয়ভাবে ধ্বংস করছে। এই সমস্ত কার্যকলাপই প্রাণীকূলের অস্তিত্বের প্রতি হুমকির সৃষ্টি করছে। তাই এই ধ্বংস রোধে পরিবেশ রক্ষার জন্য গণ সচেতনতা সৃষ্টি করাটা জরুরি। পরিবেশের সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান অসম্ভব, যদি জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া না যায়। সাধারণ মানুষকে পরিবেশ সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের জানতে হবে যে যদি আজ আমরা পরিবেশ ধ্বংস করি, তাহলে কাল তার ফল ভোগ করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিপদের সম্মুখীন হবে। আমরা পরিবেশের এক অংশ এবং পরিবেশ রক্ষা করাটা আমাদের কর্তব্য।

প্রশ্নাবলি

১। পরিবেশ কী?
২। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলো কী কী?
৩। পরিবেশের বিভিন্ন অংশগুলো কী কী?
৪। বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদানসমূহ উল্লেখ কর।
৫। স্টেটোস্ফিয়ারে থাকা ওজোন গ্যাসের স্তরের ভূমিকা কী?
৬। পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কে তুমি কী বোঝ?
৭। পরিবেশগত শিক্ষার বিস্তৃত নীতি-নির্দেশিকাসমূহ কী কী?
৮। পরিবেশ শিক্ষার মৌলিক নীতিসমূহ উল্লেখ কর।
৯। পরিবেশ শিক্ষার বিষয়সমূহের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা কর।
১০। আমাদের পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে পরিবেশগত সচেতনতা কীভাবে সহায়তা করে?

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাস্তব্যবিদ্যা সম্পর্কিত ধারণা

বাস্তব্যবিদ্যা এবং পরিস্থিতিতন্ত্রের অর্থ

বাস্তব্যবিদ্যার ইংরাজি প্রতিশব্দ 'ইকোলজি'র উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'ওইকোস' (Oikos-অর্থ গৃহ) এবং 'লগোস' (Logos-অর্থ অধ্যয়ন)-এর থেকে হয়েছে। বাস্তব্যবিদ্যা বা ইকোলজিতে জীবকূলের স্বাভাবিক বাসস্থান এবং তাদের চারপাশের পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আন্তঃক্রিয়ার অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে ইকোলজি বা বাস্তব্যবিদ্যা হচ্ছে উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং তাদের পরিবেশের আন্তর্সম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়ে অধ্যয়ন। বাস্তব্যবিদ্যার সারমর্ম নিহিত আছে উদ্ভিদ, জীবজন্তু, অনুজীব এবং তাদের পরিবেশ— সবকিছুর ঐক্যবদ্ধ অধ্যয়নের মধ্যে।

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে জটিল সম্পর্ক। উদাহরণ স্বরূপ, সবুজ উদ্ভিদসমূহ জল এবং মাটি থেকে আহার সংগ্রহ করে। এই উদ্ভিদের পাতা, ফল এবং অন্যান্য অংশ পাখি বা হরিণ আহার হিসেবে গ্রহণ করে। যখন তাদের মৃত্যু ঘটে তখন মৃত অবশেষের অংশ ব্যাক্টেরিয়া, ফাংগি ইত্যাদির আহার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকি থাকা অংশ নাইট্রজেন, কার্বন, সালফার ইত্যাদির মতো অতি ক্ষুদ্র উপাদানে পরিণত হয় এবং পুনরায় মাটিতে মিশে যায়। এইভাবে সবকিছু পরস্পরকে সংযুক্ত করে রাখে।

বাস্তব্যবিদ্যাকে বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তাকে তার গঠন প্রক্রিয়া (বর্গ বিভাগ- hierarchy) থেকে দেখতে হবে। বাস্তব্য বিদ্যায় এইসমস্ত অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায় বা বর্গসমূহ হচ্ছে ঃ জীব (organism), প্রজাতি (species), জনসংখ্যা (population), সম্প্রদায় সমূহ (communities) এবং

পরিস্থিতিতন্ত্র (ecosystems)। প্রতিটি পর্যায়ে ভৌতিক পরিবেশের সঙ্গে তাদের আন্তঃক্রিয়া (শক্তি- energy এবং পদার্থ- matter) বিশেষ প্রভাব ফেলে।

জীবকূল (Organism)

যেকোনো প্রকারের প্রাণই হচ্ছে জীব। এককোষী প্রাণী অ্যামিবা থেকে বিশালদেহী হাঙর, আণুবীক্ষণিক নীলসবুজ এলগি (শ্যাওলা) থেকে বিশাল বনস্পতি (গাছ) পর্যন্ত অসংখ্য ধরণের জীব এই পৃথিবীতে ব্যাপ্ত রয়েছে।

প্রজাতি (Species)

পারস্পরিক রূপ, আচরণ, রসায়ন এবং জিনগত সাদৃশ্য থাকা জীবের গোষ্ঠীসমূহ এক একটি প্রজাতি গঠন করে। একই প্রজাতির জীব একে অপরের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে উর্বর বংশধর উৎপন্ন করে। উদাহরণ হিসাবে মানব জাতির কথাই ধরা যাক। সমগ্র মানব জাতির (হোমো স্যাপিয়েন) একজনের সঙ্গে অন্যজনের শারীরিক গঠন, শরীরতন্ত্র যেমন একই ধরনের তেমনি তাদের সবার জিনগত গঠনও একই। এইভাবে সমস্ত গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে গঠিত হয়েছে স্যাপিয়েন প্রজাতি।

জনসংখ্যা (population)

একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করা একই প্রজাতির প্রতিটি প্রাণীকে নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীকে জনসংখ্যা বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, অসমের কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানে থাকা 'রাইনোসেরাস ইউনিকরানিস' (এক খড়গ থাকা গণ্ডার)দের নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি জনসংখ্যা।

সম্প্রদায়সমূহ (communities)

এক-একটা নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির জনসংখ্যা এবং তাদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া একটি করে সম্প্রদায় গঠন করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমরা বলি কাজিরাঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের সম্প্রদায়,

তখন আমরা বোঝাই সেই উদ্যানে থাকা গণ্ডার, হাতির জনসংখ্যা, গরু, মোষ, ছাগল ইত্যাদি অর্থাৎ পশুর জনসংখ্যা, তৃণ (grass) জনসংখ্যা এবং তাতে বসবাসকারী সমস্ত সম্প্রদায়সমূহ। এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়ায় যুক্ত বিভিন্ন ধরণের প্রজাতিকে নিয়ে একেকটি সম্প্রদায় গঠিত হয়।

পরিস্থিতিতন্ত্র (ecosystems)

পরিস্থিতিতন্ত্র হচ্ছে পরস্পরের এবং জড় উপাদানসমূহের মধ্যে জৈবিক এবং ভৌতিক আন্তঃক্রিয়ার গতিশীল কর্মজালের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন জীবের সম্প্রদায়। এই ধরণের আন্তঃক্রিয়া ব্যবস্থাটিকে স্থিতিশীল রাখে এবং পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদন জানায়। এইভাবে পরিস্থিতিতন্ত্র জৈবিক উপাদানসমূহ, জড় উপাদান (non living components) (ভৌতিক পরিবেশ) এবং তাদের আন্তঃক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কাজিরাঙার পরিস্থিতিতন্ত্র এইভাবে উদ্যানটির (সম্প্রদায়) বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর সঙ্গে জড় উপাদান, যেমন মাটি, পাথর, জল ইত্যাদি এমনকি উদ্ভিদসমূহের দ্বারা শুষে নেওয়া সৌরশক্তি এবং আন্তঃক্রিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে। পরিস্থিতিতন্ত্র হচ্ছে বাস্তব্যবিদ্যার বিস্তৃত তথা সক্রিয় গোষ্ঠী (Unit)।

পরিস্থিতিতন্ত্রের প্রকার ঃ

পরিস্থিতিতন্ত্র মূলত দুই ধরণের—

(ক) প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতন্ত্র

(খ) কৃত্রিম অথবা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতিতন্ত্র।

(ক) প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতন্ত্র ঃ এই তন্ত্রও দুই ভাগে বিভক্ত (১) স্থল ভাগের পরিস্থিতিতন্ত্র (terrestrial ecosystem)। (উদাহরণ- বনাঞ্চল পরিস্থিতিতন্ত্র, তৃণভূমি পরিস্থিতিতন্ত্র, মরুভূমি পরিস্থিতিতন্ত্র)।

(২) জলজ পরিস্থিতিতন্ত্র (Aquatic ecosystem)— এই পরিস্থিতিতন্ত্র নির্মল জল পরিস্থিতিতন্ত্র এবং সাগরীয় পরিস্থিতিতন্ত্র হতে

পারে। নির্মল জল পরিস্থিতিতন্ত্র প্রবাহমান (Lotic) (মুক্ত প্রবাহরূপে, যেমন নদী) অথবা আবদ্ধ জলেরও (lentic) (স্থির রূপের, যেমন পুকুর, হ্রদ) হতে পারে।

(খ) মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতিতন্ত্র ঃ এইসমস্ত পরিস্থিতিতন্ত্র কৃত্রিমভাবে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। উদাহরণস্বরূপে— শস্যভূমি পরিস্থিতিতন্ত্র, ফিসারির মৎস্য পালন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(ক) প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতন্ত্র ঃ এই পরিস্থিতিতন্ত্র প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, যেখানে মানুষের সঙ্গে কোনো ধরনের আন্তঃক্রিয়া নেই। এটা হচ্ছে এমন এক অবস্থা যেখানে সমস্ত বস্তুই ভারসাম্যের মধ্যে রয়েছে। এই অবস্থা থেকে যদি একটা উপাদান সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সমগ্র ব্যবস্থাটিই ভেঙে পড়বে। প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতন্ত্র তাদের আবাসভূমি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই ব্যবস্থার দুটো প্রকার হচ্ছে ভূস্থলীয় এবং জলজ। মরুভূমি, বনাঞ্চল, তৃণভূমি (meadows) গাছপালাহীন দীর্ঘ তৃণের বিস্তীর্ণ এলাকা (prairies), জঙ্গল ইত্যাদি হচ্ছে ভূস্থলীয় পরিস্থিতিতন্ত্র। অন্যদিকে জলজ পরিস্থিতিতন্ত্রে রয়েছে সমস্ত সাগর, মহাসাগর, উপসাগর এবং নির্মল জল।

(খ) কৃত্রিম পরিস্থিতিতন্ত্র ঃ কৃত্রিম পরিস্থিতিতন্ত্র মানবজাতি কিছুটা পৃথকভাবে নির্মাণ করেছে। যেমন, পুকুর কেটে তার পারের চারদিকে গাছ রোপণ করা হয়েছে এবং পুকুরের জলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ করা আর্দ্রভূমিকে ভারসাম্যের মধ্যে রাখতে এবং পরিস্থিতিতন্ত্রকে বজায় রাখতে মানব জাতির হস্তক্ষেপ আবশ্যক। পুকুরগুলো জল দিয়ে পরিপূর্ণ করে রাখতে হবে যাতে গাছ এবং মাছের বৃদ্ধি সম্ভব হয়, আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং পুকুরের মাছ শিকার করা প্রাণী এবং উদ্ভিদ আহার করা

পশুগুলোকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অন্যান্য কৃত্রিম পরিস্থিতিতন্ত্রগুলো হল, ফলের বাগান, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উদ্যানসমূহ এবং ক্রিয়াকলাপ।

পরিস্থিতিতন্ত্রের পরিকাঠামো

জৈবিক (biotic) এবং অজৈবিক (abiotic) উপাদানসমূহের রচনা এবং সংগঠনই পরিস্থিতিতন্ত্রের পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে।

জৈবিক পরিকাঠামো (biotic structure) ঃ পরিস্থিতিতন্ত্রের উদ্ভিদ, জীব-জন্তু এবং অণুজীবসমূহ নিয়েই জৈবিক উপাদান গঠিত হয়েছে। জৈবিক উপাদানসমূহকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) স্বভোজী এবং (খ) পরভোজী

(ক) স্বভোজী (Autotrophs) ঃ এগুলোকে উৎপাদক হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। এগুলো নিজেই বাতাসে থাকা কার্বন-ডাই অক্সাইড (Carbon dioxide), জল এবং সূর্যের রশ্মির মাধ্যমে গাছের পাতায় থাকা ক্লরোফিল (সবুজ কণিকা বা পত্রহরিৎ) ব্যবহার করে সালোক সংশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা নিজের আহার তৈরি করে নিতে পারে। কিছু অণুজীবও আছে। যারা জৈবিক পদার্থকে সূর্যের রশ্মির অনুপস্থিতিতে জারণ প্রক্রিয়ার (Oxidation) মাধ্যমে নিজের আহার তৈরি করে নেয়।

(খ) পরভোজী (Heterotrophs) ঃ এই শ্রেণির জীবই নিজের আহার নিজে তৈরি করতে পারে না। এগুলো তাদের আহার উৎপাদকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। তাই এদের বলা হয় উপভোক্তা। এই উপভোক্তা আবার দুই প্রকারের— বৃহৎ উপভোক্তা (macro consumers) এবং ক্ষুদ্র উপভোক্তা (micro consumers)।

বৃহৎ উপভোক্তা ঃ যে সমস্ত জীবজন্তু উৎপাদকদের কাছ থাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আহার হিসাবে উপভোগ করে তাদের বৃহৎ উপভোক্তা বলা হয়। এগুলোকে চারভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১। তৃণভোজী (Harbivores) ঃ যে সমস্ত জীবজন্তু সমগ্রিকভাবে উৎপাদকদের আহার হিসাবে গ্রহণ করে তাদের তৃণভোজী বা প্রাথমিক উপভোক্তা বলা হয়। যেমন, গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি।

২। মাংসভোজী (Carnivores) ঃ এই সমস্ত প্রাণী অন্য উপভোক্তাকে আহার করে। যদি তারা তৃণভোজীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপভোক্তা (Secondary consumer) বলা হয়। যেমন, বেং। যদি তারা অন্যান্য মাংসভোজীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তাদের তৃতীয় পর্যায়ের উপভোক্তা (Tertiary consumer) বলা হয়। যেমন সাপ, বড়ো মাছ ইত্যাদি।

৩। মাংস এবং উদ্ভিদভোজী (Omnivores) ঃ এই সমস্ত প্রাণী জীবজন্তু উদ্ভিদ ইত্যাদি সবকিছুকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন- মানুষ, শেয়াল, ইঁদুর ইত্যাদি।

৪। মৃতভোজী (Detritivores) ঃ এই সমস্ত প্রাণী সাধারণত জীবজন্তুর মৃতদেহ, আংশিকভাবে পচে যাওয়া বস্তু, অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীর মল বা বর্জ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন, গোবরে পোকা, পিঁপড়ে, কেঁচো ইত্যাদি।

৫। ক্ষুদ্র উপভোক্তা (Micro consumers) ঃ এই ধরণের কিছু জীব রয়েছে যারা পচে যাওয়া বা ভেঙে পরা মৃত উদ্ভিদ এবং পরিবেশে থাকা জৈবিক বস্তুসমূহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। এগুলোকে পচনকারক বা বিযোজক (decomposer) বা ক্ষুদ্র উপভোক্তা বলা হয়। যেমন, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি।

অজৈবিক কাঠামো (Abiotic Structure)

পরিস্থিতিতন্ত্রের ভৌতিক এবং রাসায়নিক উপাদানসমূহকে নিয়েই অজৈবিক কাঠামো গঠিত হয়েছে। এতে সূর্যের আলো, দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ, গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের ধরন, বাতাসের গতিবেগ (wind velocity) ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের ভৌতিক কারককে (Physical factors) যুক্ত করার পাশাপাশি মাটির অবস্থা সম্পর্কীয় (edaphic) কারকসমূহকেও সংযুক্ত করা হয়েছে।

রাসায়নিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রধান পুষ্টিকারক হচ্ছে কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, অক্সিজেন, পটাসিয়াম, ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ, যেমন শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট), জৈব আমিষ (প্রটিন), নিউক্লিক অ্যাসিড, অন্যান্য নানা ধরণের পদার্থ এবং এইগুলো পরিস্থিতিতন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

পরিস্থিতিতন্ত্র ক্রিয়া বা কাজকর্ম (Function of an ecosystem)

প্রাকৃতিক অবস্থাসমূহের মধ্যে এক প্রণালিবদ্ধ উপায়ে পরিস্থিতিতন্ত্র আর সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই ব্যবস্থা সূর্য থেকে শক্তি (energy) সংগ্রহ করে বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন উপাদানসমূহে প্রেরণ করে। পরিস্থিতিতন্ত্রের প্রতিটি অংশের মধ্যে ক্রিয়াগত প্রভাব রয়েছে। কোনো পরিস্থিতিতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ খাদ্য শৃঙ্খল, খাদ্যজাল, পৌষ্টিক স্তর, শক্তির প্রবাহ, পৌষ্টিক চক্র ইত্যাদির মাধ্যমে বর্ণনা করা যায়।

খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল এবং পৌষ্টিক স্তর (Food Chain, Food Web and Trophic level)

খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain)

যেকোনো পরিস্থিতিতন্ত্রে কোনো জীবই আহার গ্রহণ করা এবং অন্য জীবের দ্বারা ভক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া আনুক্রমিক শৃঙ্খলকেই খাদ্য শৃঙ্খল বলা হয়।

খাদ্য শৃঙ্খলের সাধারণ উদাহরণ (common examples) সমূহ এই ধরণের ঃ

ঘাস— পশু— বাঘ (এই শৃঙ্খল তিনটি সংযোজক নিয়ে গঠিত)

ঘাস— ফড়িং— পাখি— বাজপাখি

(এই শৃঙ্খল চারটি সংযোজন নিয়ে গঠিত)

উদ্ভিদ প্লাবক (Phytoplankton)— জলের কীট বা পোকা (Water fleas)- ক্ষুদ্র মাছ- টুনা মাছ (Tuna)

প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতন্ত্রে দুই প্রকারের খাদ্যশৃঙ্খল দেখতে পাওয়া যায়। এক প্রকারের খাদ্যশৃঙ্খল শুরু হয় সবুজ উদ্ভিদ থেকে (autotrophs)। এই খাদ্যশৃঙ্খল নিয়ে গঠিত হয় প্রথম পৌষ্টিক স্তর। তৃণভোজীদের নিয়ে গঠিত হয় দ্বিতীয় পৌষ্টিক স্তর এবং মাংসাশী প্রাণী নিয়ে গঠিত হয় তৃতীয় পৌষ্টিক স্তর। এদের চারণ খাদ্যশৃঙ্খল বলে গণ্য করা হয়। অন্য প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল শুরু হয় এই সবুজ বৃক্ষ তথা আবর্জনা পচে গলে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হওয়া বালি-মাটি ইত্যাদি থেকে। একে বলা হয় ক্ষয়জনিত কারণে সৃষ্ট (detritus) খাদ্যশৃংখল। খাদ্যশৃঙ্খল সবসময় একদিকমুখী (unidirectional)।

খাদ্যজাল (Food Web)

কিছু সংখ্যক খাদ্যশৃঙ্খল একে অপরের সঙ্গে সংযোগের ফলে ঠিক মাকড়সার জালের মতো খাদ্যজালের সৃষ্টি করে। কয়েকটি সংযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খল নিয়ে গঠিত এই অন্তর্বন্ধনযুক্ত রূপকে খাদ্য জাল (Food web) বলা হয়। তাই খাদ্যজাল হচ্ছে খাদ্যশৃঙ্খলের এমন এক কর্মজাল (network) যেখানে বিভিন্ন ধরনের জীব (Organisms) বিভিন্ন ধরনের পৌষ্টিক স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে প্রতিটি পৌষ্টিক স্তরে আহার ভক্ষণ করা এবং ভক্ষিত হওয়ার কয়েকটি উপায় রয়েছে।

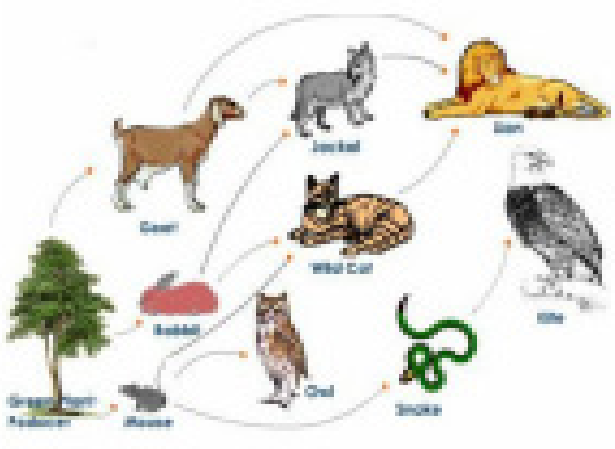

পরিস্থিতিতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো ক্রিয়া যেমন শক্তির প্রবাহ (energy flow) এবং পুষ্টি চক্র (nutrient cycling) তাদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

পৌষ্টিক স্তর (Trophic level)

যেকোনো পরিস্থিতিতন্ত্রে প্রতিটি জীবকে একেকটি আহার পর্যায় বা স্তর হিসাবে গণ্য করা যায়। একেই পৌষ্টিক স্তর বলে গণ্য করা হয়। একই উৎস থেকে শক্তি আহরণ করা জীবন্ত জীবসমূহ একটি পৌষ্টিক স্তরের বলে গণ্য হবে। এইভাবে সবুজ উদ্ভিদ প্রথম পৌষ্টিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত (উৎপাদক) হবে। তৃণভোজী প্রাণীরা দ্বিতীয় পৌষ্টিক স্তরভুক্ত (প্রাথমিক উপভোক্তা) হবে। মাংসভোজী প্রাণীরা অন্তর্ভুক্ত হবে তৃতীয় পৌষ্টিক স্তরে। এইভাবে বাকিগুলো অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত হবে।

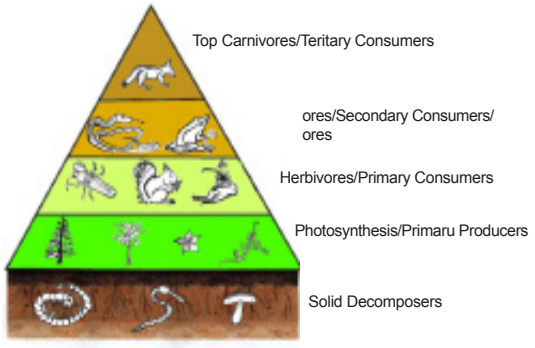

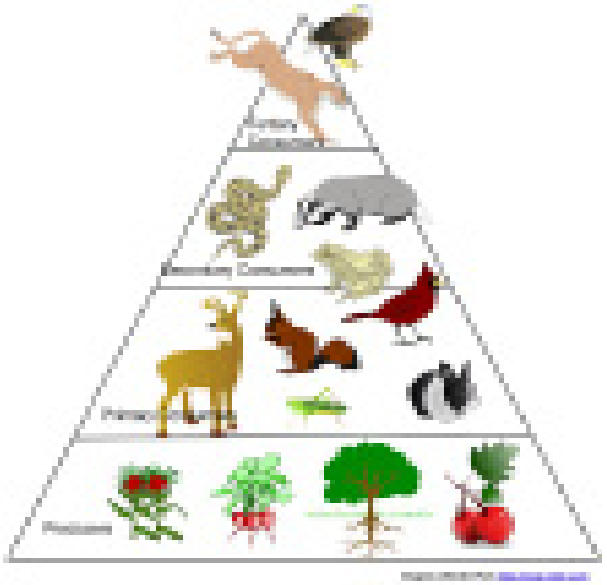

বাস্তব্যবিদ্যা পিরামিড (Ecological pyramids)

যেকোনো পরিস্থিতিতন্ত্রে একেবারে নিম্ন স্তরের উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত উপভোক্তাদের ক্রমিক পৌষ্টিক স্তরের কাঠামো এবং ক্রিয়া-কর্মের গ্রাফিক রূপকে পরিবেশীয় পিরামিড বলা হয়। পরিবেশীয় পিরামিড তিন প্রকার—

সংখ্যার পিরামিড ঃ এতে প্রতিটি জীবের সংখ্যা উল্লিখিত থাকে;

জৈবিক ওজনের পিরামিড ঃ এই পিরামিড সম্পূর্ণ শুকনো ওজন অথবা জীবন্ত বস্তুর সামগ্রিক পরিমাপের অন্যান্য পরিমাপের ভিত্তিতে নির্মিত।

শক্তির পিরামিড ঃ এই পিরামিডে শক্তির আত্মীকরণ ঘটে তথা ক্রমিক পৌষ্টিক স্তরসমূহে উৎপাদনশীলতাকে দেখানো হয়। পৌষ্টিক স্তরসমূহের মধ্যে জৈবিক ওজন এবং শক্তির প্রবাহের তুলনার জন্য পরিবেশীয় পিরামিডগুলো ব্যবহার করা হয়। পরিস্থিতিতন্ত্র এবং শক্তির স্থানান্তরের দিক থেকে সম্প্রদায়সমূহে অধিক যোগ্যগুলোর চিহ্নিতকরণ এবং তুলনার জন্য এই ধরণের তুলনাসমূহ ব্যবহার করা যায়।

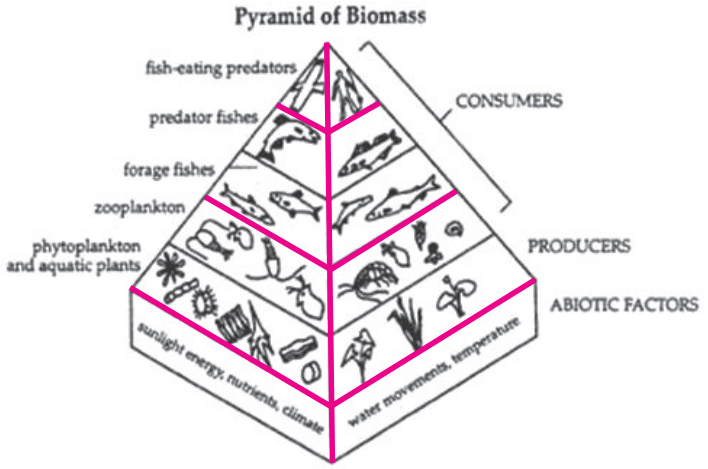

প্রশ্নাবলি

১। ইকোলজি বা বাস্তব্য বিদ্যার সংজ্ঞা নির্ণয় কর।

২। পরিস্থিতিতন্ত্র বলতে তুমি কী বোঝ?

৩। পরিস্থিতিতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ কর।

৪। প্রবহমান এবং স্থির জলরাশির পরিস্থিতিতন্ত্র কী? উদাহরণ দাও।

৫। উৎপাদক, উপভোক্তা এবং পচনকারক কাকে বলে?

৬। পরিস্থিতিতন্ত্রের কাঠামো এবং ক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৭। খাদ্যশৃঙ্খল এবং খাদ্যজাল কী?

৮। পৌষ্টিক স্তর কী?

৯। পরিবেশীয় পিরামিড বলতে তুমি কী বোঝ? বিভিন্ন প্রকারের পরিবেশীয় পিরামিডের নাম উল্লেখ কর।

১০। খাদ্যশৃঙ্খল এবং খাদ্যজালের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়
জৈব বৈচিত্র্য এবং তার সংরক্ষণ

জৈব বৈচিত্র্যের সংজ্ঞা ঃ

'জৈবিক বৈচিত্র্য' (biological diversity) সংক্ষেপে জৈব বৈচিত্র্য (bio diversity) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এতে জীবের সংখ্যা, পৃথিবীর সমস্ত ধরণের প্রাণীর বিভিন্নতা এবং স্বকীয়তা বোঝাতে এই সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। এতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উদ্ভিদ, জীব-জন্তু তথা অণুজীবসমূহ, তাতে থাকা জিনসমূহ, এবং তারা যার অংশ, এই সমস্ত কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জৈব বৈচিত্র্যকে সাধারণ তিনটি পর্যায়ে বর্ণনা করা হয় ঃ জিনগত, প্রজাতি এবং পরিস্থিতিতন্ত্র জৈব বৈচিত্র্য।

জিনগত জৈব বৈচিত্র্য ঃ

একেকটা প্রজাতির শরীরে থাকা জিনসমূহের বৈচিত্র্যই হচ্ছে জিনগত জৈব বৈচিত্র্য। এই জিনগুলো বংশানুক্রমিকভাবে উত্তর প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে এমন ধরনের বৈচিত্র্য যা প্রজাতিসমূহের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে। এর একটি উদাহরণ, বাসমতি চাল জোহা চাল থেকে একেবারেই পৃথক। কিছু কিছু পার্থক্য সহজেই চোখ দিয়ে দেখা যায়, যেমন, আকার ও রং এবং স্বাদ ও গন্ধ। অর্থাৎ, অনুভূতির মাধ্যমেও অনুভব করা যায়।

প্রজাতি জৈব বৈচিত্র্য

পৃথিবীতে থাকা কোটি কোটি ধরনের জীবকে শ্রেণিবদ্ধ করা প্রজাতিসমূহকে এক একটি গোষ্ঠী হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। প্রতিটি প্রজাতি অন্যান্য প্রজাতিসমূহ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক, ঘোড়া এবং গাধা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের প্রজাতি। একইভাবে সিংহ এবং বাঘও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি। একেকটি প্রজাতির সদস্যদের জিনগতভাবে এতটাই সাদৃশ্য আছে যে তারা

বংশবৃদ্ধির জন্য সন্তান প্রজননও করতে পারে। এই সাদৃশ্য প্রজাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। প্রজাতি বৈচিত্র্যকে সাধারণত পরিমাপ করা হয় একেকটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করা প্রজাতিসমূহের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে।

পরিস্থিতিতন্ত্র জৈব বৈচিত্র্য

পরিস্থিতিতন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের জীবের (উদ্ভিদ, জীবজন্তু, অনুজীব) পারস্পরিক এবং অজৈব উপাদানের (মাটি, বায়ু, জল, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি) সঙ্গে চলমান আন্তঃক্রিয়া। সুতরাং পরিস্থিতিতন্ত্র হচ্ছে জীবসমূহের বসতিস্থানের বৈচিত্র্য, যা এই ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জীবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতন্ত্র বৈচিত্র্যের ধারণা যে কোনো জৈব ভৌগোলিক অথবা রাজনৈতিক সীমার মধ্যে থাকা পরিস্থিতিতন্ত্র বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়।

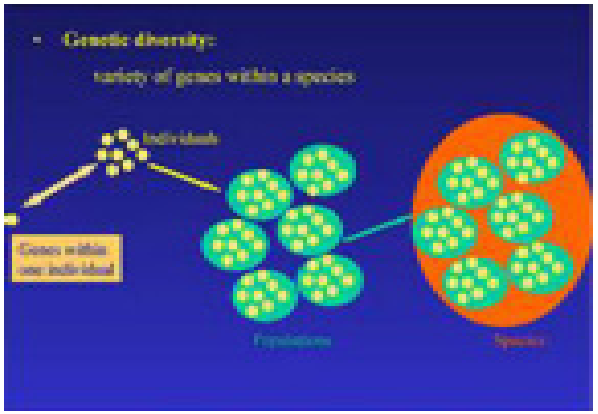

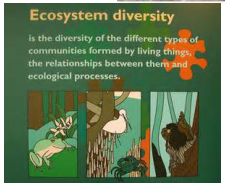

জৈব বৈচিত্র্যের মূল্য (Value of Biodiversity)

জৈব বৈচিত্র্য কথাটি একটি বিমূর্ত ধারণার মতো। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি দিক ছুঁয়ে যায়। এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকারের উদ্ভিদ এবং জীব-জন্তু (গৃহপালিত এবং বন্য) রয়েছে। এই বৈচিত্র্যই সমগ্র বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের খাদ্য, রোগ নিরাময় বস্তু বা ভেষজ, বস্ত্র, আশ্রয়, আধ্যাত্মিক এবং বিনোদনমূলক প্রয়োজনগুলো পূরণ করে। এই বৈচিত্র্যই পরিস্থিতিতন্ত্রে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, যেমন, পরিচ্ছন্ন জল যোগান, পুষ্টিচক্র এবং ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদি অব্যাহত রাখাকে সুনিশ্চিত করে। মোট কথা জৈব বৈচিত্র্যের ক্ষতির অর্থ হচ্ছে মানব জাতির অস্তিত্বের প্রতি হুমকি।

উপভোক্তামূলক ব্যবহার (Consumptive use)

মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে জৈব বৈচিত্র্যের উপাদানসমূহ, যেমন, ইন্ধন, খাদ্য, ঔষধ, তন্তু ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে। বিশ্বের খাদ্যের ৯০ শতাংশই আসে উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ থেকে। শস্য এবং পশুধন প্রজননের জিনগত বৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শস্য উৎপাদক তথা পালনকারীদের জন্য কীট এবং রোগ প্রতিরোধী নতুন প্রকারের শস্য প্রজাতির জন্ম দেওয়ার জন্য শস্য বৈচিত্র্য অত্যন্ত প্রয়োজন। শস্য প্রজাতিসমূহের বৈচিত্র্যের ক্ষতি বিশ্বজুড়ে খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করে। শুধু একটি প্রজাতির কীটের ব্যাপক আক্রমণ বা একটি রোগই সমস্ত শস্য বা এক বিশেষপ্রকারের পশুধনকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষই প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পরম্পরাগত ঔষধের ওপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত পরম্পরাগত ঔষধ ভেষজ, উদ্ভিদ, কিছু জীবজন্তু এবং খনিজ উৎস থেকে তৈরি করা হয়। এণ্টিবায়োটিক ঔষধ হিসাবে আমরা যে পেনিসিলিন ওষুধ ব্যবহার করি এই ওষুধ পেনিসিলিয়াম নামের এক ধরণের ফাঙ্গাস থেকে তৈরি করা হয়। একইভাবে আমরা টেট্রাসাইক্লিন ওষুধ পাই 'ব্যাকটোরাম' থেকে, এসপিরিন পাই ফিলিপেণ্ডুলৌমারিয়া' নামের উদ্ভিদ থেকে এবং কুইনাই পাই 'সিংকোনা' গাছের ছাল থেকে। ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত কাঠ, জীবাশ্ম ইন্ধন (যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম), প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ দ্রব্য আমরা সবাই ব্যবহার করছি।

উৎপাদনমূলক ব্যবহার (Productive use)

জৈব বৈচিত্র্যের বিভিন্ন উৎস থেকে বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত বা উৎপাদন করা সামগ্রীই উৎপাদনমূলক সামগ্রী। বর্তমান কালেও পরম্পরাগত সম্প্রদায় সমূহের অধিকাংশই সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে তাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্য, আশ্রয়স্থল, বস্তুবিশেষ ঘরোয়া প্রয়োজনের সামগ্রী, ঔষধ, সার এবং বিনোদনের জন্য এই সমস্ত উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। হাতির দাঁত, পাটপোকা থেকে তৈরি করা পাটের কাপড়, ভেড়ার লোম থেকে তৈরি উলের কাপড়, লা পোকা থেকে উৎপন্ন লা ইত্যাদি প্রাণীবৈচিত্র্য থেকে আহরণ করা হয়। এমনকি বহু শিল্পোদ্যোগ উদ্ভিদ সামগ্রীর ওপর নির্ভরশীল। যেমন— কাগজ এবং কাগজের মণ্ড উদ্যোগ, চিনি উদ্যোগ, প্লাইউড উদ্যোগ, রেলের শ্লিপার ইত্যাদি।

সামাজিক ব্যবহার (Social use)

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, উৎসব-পার্বন, পূজা-অর্চনা ইত্যাদিতে উদ্ভিদ এবং জীব-জন্তুর ব্যবহারের প্রথা সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক রীতি-নীতি। মাঙ্গলিক পুষ্প হিসাবে মন্দিরে দেবী কালীর পূজায় জবাফুল অর্পণ করা হয়, শিবের পূজায় ধুতরা ফুল অর্পণ করা হয়। একইভাবে আমের বিভিন্ন অংশ, তুলসি, পদ্ম, বেল গাছ ইত্যাদিও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তুর প্রজাতি, যেমন— গরু, ছাগল, মোষ ইত্যাদিও বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনায় কাজে লাগানো হয়। কিছু সংখ্যক জীব-জন্তুকে বিভিন্ন দেব-দেবীর বাহন হিসাবে বিশ্বাস করা হয় এবং এইভাবে সেই সমস্ত জন্তুকে শ্রদ্ধা করা হয়। ভারত এবং অন্যান্য কিছু দেশে কোনো কোনো অরণ্যকে বিশেষ দেবতার বাসস্থান বলে বিশ্বাস করে পরম্পরাগতভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়। যুগ যুগ ধরে স্থানীয় সমাজ এই অরণ্যসমূহকে সংরক্ষণ করে আসছে এবং সেগুলোকে পবিত্র অরণ্য (sacred groves) বলা হয়ে থাকে। এই নিরাপত্তার ফলে এই এলাকাসমূহ বিশেষ জৈব বৈচিত্র্যের স্থান হিসাবে সংরক্ষিত হয়েছে।

নৈতিক ব্যবহার (Ethical use)

প্রতিটি প্রজাতি অনন্য এবং এই প্রত্যেকটি প্রজাতির বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কোনো একটি প্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন করার অধিকার মানুষের নেই। কোনটা শুদ্ধ এবং কোনটা ভুল, ভাল অথবা মন্দ সেটা নির্ধারণ করার ভিত্তিটি আসে নৈতিকতা থেকে। ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রসংঘের গ্রহণ করা প্রকৃতির বিশ্ব সনদে বলা হয়েছে, মানুষের জন্য মূল্যবান হোক বা না হোক, যে কোনো রূপের প্রতিটি জীবেরই মর্যাদা রয়েছে এবং অন্য অণুজীবসমূহও যাতে এই ধরণের স্বীকৃতি লাভ করে তার জন্য মানুষকে একটি নৈতিক, কার্যবিধির মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে।

নৈসর্গিক ব্যবহার (Aesthetic use)

প্রতিটি প্রজাতি এবং পরিস্থিতিতন্ত্র পৃথিবীর জীবজগতকে ব্যতিক্রমী এবং সৌন্দর্যশীল করে। সাগরের ওপর সূর্যাস্ত, নৃত্যরত হরিণী, পাখির সুমিষ্ট গান, প্রথম বর্ষণের শেষে উঠে আসা সোঁদা মাটির গন্ধ ইত্যাদি থেকে মানুষ যে অনাবিল আনন্দ লাভ করে তা অন্য কোনো কৃত্রিম মাধ্যম দিতে পারে না। একটি প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) যদি একবার ধ্বংস হয় তাকে ফের সৃষ্টি করা অসম্ভব। কোনো একটি প্রাকৃতিক স্থানে যত বেশি মানুষ ভ্রমণ করে তাতেই এই স্থানটির নান্দনিক গুরুত্ব প্রকাশ পায়। কোনও মানুষই একটি পরিত্যক্ত স্থান দর্শন করতে চায় না। আমরা সাধারণত একটি জাতীয় উদ্যানের সৌন্দর্য উপভোগ করার চেষ্টা করি।

জৈব বৈচিত্র্যের প্রতি হুমকি

প্রজাতির অবলুপ্তি বা নিঃশ্চিহ্নকরণ হচ্ছে বিবর্তনের একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে অসংখ্য প্রজাতির নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

সাধারণভাবে পরিবেশ এবং বিশেষত জৈববৈচিত্র্য সম্পর্কে মানব সমাজের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ একটা বড়ো আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে জৈব বৈচিত্র্যের প্রতি আসা হুমকিসমূহ হচ্ছে—

ক) বাসস্থান ধ্বংস

বাণিজ্যিক কারণে গাছ কাটা, কৃষিকর্ম এবং বাসভূমি গড়ে তুলতে বনাঞ্চল বে-দখল, পাহাড়ের ঢালু এলাকায় জুম চাষ এবং আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রাকৃতিক বাসস্থানসমূহ ধ্বংস হওয়ার ফলে জৈব বৈচিত্র্যের প্রতি গুরুতর হুমকি নেমে এসেছে। রাস্তাঘাট, রেলপথ, শিল্পোদ্যোগ, বৃহৎ বাঁধ ইত্যাদির নির্মাণকার্য পরিবেশের ওপর গুরুতর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে।

খ) পশুধনের অনিয়ন্ত্রিত বিচরণ

পশুধনের অনিয়ন্ত্রিত বিচরণও হচ্ছে জৈব বৈচিত্র্যের প্রতি একটা বড়ো সমস্যা। যেহেতু ঘাস থাকা অঞ্চলসমূহ একটা সরু এলাকায় আবদ্ধ, তাই তার উপর চাপ উপেক্ষণীয় নয়। এ মাটির উপরের পৃষ্ঠের ক্ষয় বৃদ্ধি করে এবং এভাবে জৈব বৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়।

গ) চোরা শিকার

বাসস্থান ধ্বংসের পেছনে জৈব বৈচিত্র্যের প্রতি আসা বড় হুমকিটি হচ্ছে চোরা শিকার। আন্তর্জাতিক ব্যবসার জন্য হাতি, গণ্ডার, বাঘ ইত্যাদির নিয়মিতভাবে চোরা শিকার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিপন্ন প্রজাতি সমূহের কাছ থেকে উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবসায় নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বন্যপ্রাণীর লোম, চামড়া, খর্গ, হাতির দাঁত ইত্যাদির ব্যবসা পূর্ণগতিতে চলছে।

ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বন্যাবিপর্যস্ত কাজিরাঙা অরণ্যে সন্তানসহ মা গন্ডার

বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, ঝড় ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ জৈব বৈচিত্র্যের যে ক্ষতি করে তা অপূরণীয়।

ঙ) জলবায়ু পরিবর্তন এবং গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি

জলবায়ুর পরিবর্তনকে প্রায়ই জৈব বৈচিত্র্যের প্রতি গুরুতর হুমকি বলে ধরা হচ্ছে। জলবায়ুর স্বরূপ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে বহু জীব-প্রজাতি তাকে সহ্য করতে পারে না এবং ফলে তাদের মৃত্যু ঘটে। কৃষিক্ষেত্রের ওপর জলবায়ুর পরিবর্তন এবং গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্নজনের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধরনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলসমূহের গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলসমূহ বেশি প্রভাবিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভূমির জলভাগ হ্রাস পাচ্ছে এবং বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি বিশ্বের জৈব বৈচিত্র্যকে সামূহিক বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিয়ে একটা গুরুতর হুমকির সৃষ্টি করেছে। এক সমীক্ষা অনুযায়ী হুমকির মাধ্যমে সৃষ্ট জৈববৈচিত্র্যের বিলুপ্তির হার হচ্ছে (আগামী ৫০-৬০ বছরে সমস্ত প্রজাতির) ১৫-৩০ শতাংশ।

চ) জীবসম্পদের চোরাকারবার বা বায়োপাইরেসি (Biopiracy)

বায়োপাইরেসি হচ্ছে একটি দেশ থেকে জীব সম্পদ হস্তান্তর করে কোনো এক স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং তার মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যের পেটেন্ট বা অধিকার আদায় করা। কোনো কোনো দেশের স্থানীয় জনসাধারণ হচ্ছে জ্ঞান এবং বিশ্বাসের সঞ্চয়কেন্দ্রস্বরূপ। কিছু কিছু কোম্পানির এজেন্ট বা দালালরা এই পরম্পরাগত জ্ঞান বা মূল্যবান জীব পদার্থ সংগ্রহ করে এবং সেগুলোকে নিজেদের পেটেন্ট লাভ করার উপযোগী করে তুলে। এভাবেই তারা এই সমস্ত সামগ্রীর-ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য অনৈতিক প্রক্রিয়ায় অধিকার আদায় করে নেয়। বিভিন্ন দেশে এই ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে। কিছু নির্দিষ্ট জীব সম্পদের চোরা কারবার বা বায়োপাইরেসি জৈব বৈচিত্র্যের জন্য হুমকি স্বরূপ।

জৈব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ

জৈববৈচিত্র্য হচ্ছে এমন একটি গোলকীয় সম্পদ যাকে কোনো মূল্যে মাপা সম্ভব নয়। জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে মানুষসহ সমস্ত ধরনের

জীবের লাভের জন্য নিজস্ব পরিস্থিতিতন্ত্রের সঙ্গে জীবসম্পদের উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং তার ব্যবস্থাপনা। এই কাজের জন্য জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জৈববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ দুই ধরনের হতে পারে—

(ক) অন্তঃ সংরক্ষণ (In-situ conservation)

(খ) বহিঃ সংরক্ষণ (Ex-situ conservation)

ক) অন্তঃ সংরক্ষণ ঃ অন্তঃ সংরক্ষণ হচ্ছে বনজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে তাদেরই প্রাকৃতিক বাসস্থানে করা সংরক্ষণ, অর্থাৎ নিজেদের আবাসস্থলে করা সংরক্ষণ, যেমন— বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ইত্যাদি। ভারতে এই ধরনের সংরক্ষণের দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। সমগ্র দেশে কিছু সংরক্ষিত এলাকার একটি জাল তৈরি করে এই সংরক্ষণের কাজ করা হচ্ছে। এখন ভারতে ৫৩৩ টিরও বেশি জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্য রয়েছে। এই সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে দেশের মোট ভূ-খণ্ডের ৪.৩ শতাংশ। এই ধরনের ব্যবস্থা জীবের বাসস্থান এবং সেই স্থানগুলোর জৈব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে সহায়ক হয়েছে। কিছু-কিছু প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন বলে চিহ্নিত হওয়ায় বিশেষ কিছু প্রকল্পও শুরু করা হয়েছে। অসমে এখন ৫ টি জাতীয় উদ্যান এবং ২২ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে। কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান এবং পবিতরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে এশীয় গণ্ডার (Asiatic Rhino) সংরক্ষণ করা হয়েছে। কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান হরিণ এবং হাতিরও বাসস্থান। মানস বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, মানস জাতীয় উদ্যান সোনালি বাঁদর এবং জলহস্তীর বিচরণভূমি।

অসমের জাতীয় উদ্যানসমূহ ঃ

১। কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান

২। মানস জাতীয় উদ্যান

৩। ওরাং জাতীয় উদ্যান

৪। নামেরি জাতীয় উদ্যান

৫। ডিব্রু সৈখোয়া জাতীয় উদ্যান

খ) বহিঃ সংরক্ষণ ঃ বাহ্যিক সংরক্ষণ হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থান থেকে সড়িয়ে নিয়ে অন্য কোনো স্থানে সংরক্ষণ করা। তা কোনো প্রাণী উদ্যান এবং উদ্ভিদ উদ্যান বা বন প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হতে পারে। শস্য, জীবজন্তু, পাখি এবং মৎস্য প্রজাতির জিন (বা আনুবংশিক) পর্দা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য বহু প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ব্যুরো অব প্ল্যাণ্টচ জেনেটিক রিসোর্স (নয়া দিল্লী), ন্যাশনাল ব্যুরো অব এনিমেল জেনেটিক রিসোর্স (কার্নাল) ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এই কাজ করা হচ্ছে।

জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল ঃ

বিধায়িনী ঃ জৈব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের জন্য ভারতে কয়েকটি আইন বলবৎ করা হয়েছে। তার মধ্যে কায়েকটি আইন হচ্ছে—

বন আইন, ১৯২৭ ঃ এই আইন সংরক্ষিত, সুরক্ষিত এবং গ্রাম্য বনাঞ্চলের পরিচালনার সঙ্গে বনজ সম্পদের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত।

বন (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২, এবং বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) সংশোধিত আইন, ১৯৯১ ঃ এই দুই আইন জীবজন্তুর শিকারে বাধা দেওয়া এবং নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিশেষ উদ্ভিদকে সুরক্ষা দিয়ে থাকে। অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যানের স্থাপন এবং পরিচালনা, কেন্দ্রীয় চিরিয়াখানা কর্তৃপক্ষ স্থাপন, চিরিয়াখানা নিয়ন্ত্রণ এবং আবদ্ধ প্রজনন এই আইনের অন্তর্গত। বন্যপ্রাণীর প্রাণীজাত সামগ্রী এবং সজ্জিত সামগ্রী ইত্যাদির ব্যবসা এবং বাণিজ্যকে এই আইন নিয়ন্ত্রণ করে।

বন সুরক্ষা আইন, ১৯৮০ ঃ বনাঞ্চলের মাটি অবনাঞ্চলীয় কার্যকলাপে বাধা আরোপ বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি তদারক করে এই আইন।

পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ ঃ কিছু বিশেষ এলাকায় শিল্পোদ্যোগ এবং অন্যান্য কিছু কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞাসহ পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হাতে নেওয়া ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত এই আইন। এই আইন ক্ষতিকারক দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, নির্গমন এবং সরবরাহ ইত্যাদির প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত।

প্রশ্নাবলি

১। জৈববৈচিত্র্যের সংজ্ঞা লেখ।

২। উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর—
আনুবংশিক (বা জিন) বৈচিত্র্য, প্রজাতির বৈচিত্র্য এবং পরিস্থিতিতন্ত্র বৈচিত্র্য।

৩। জৈববৈচিত্র্যের মূল্যসমূহ কী কী?

৪। উপভোক্তামূলক মূল্য কী?

৫। উৎপাদনমূলক মূল্য কী?

৬। জৈববৈচিত্র্যের প্রতি প্রধান হুমকি সমূহ কী?

৭। জৈববৈচিত্র্যের বহিঃ এবং আন্তঃসংরক্ষণ কী? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

৮। জীব সম্পদের চোরাব্যবসা (বা বায়োপাইরেসি) কী?

৯। আমাদের দেশের দুটো জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিষয়ে উল্লেখ কর।

১০। ধরিত্রী সম্মেলন কোন বছর অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

চতুর্থ অধ্যায়
প্রাকৃতিক সম্পদ

আমরা যে জগতে বাস করি তা বিভিন্ন ধরনের সম্পদে পরিপূর্ণ। মানব সভ্যতার বিকাশ এবং কল্যাণ এই সম্পদসমূহের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। যেহেতু এই সম্পদসমূহ প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায়, তাই সেগুলোকে বলা হয় প্রাকৃতিক সম্পদ। যে কোনো সম্পদ থেকে মূল্যবান সামগ্রী লাভ করা সম্ভব। এইভাবে ভূমি, জল, বাতাস, খনিজ সম্পদ, কয়লা, অরণ্য, জীবজন্তু ইত্যাদি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ দুই প্রকারের ঃ

(ক) নবীকরণযোগ্য সম্পদ (Renewable resources)

(খ) নবীকৰণ অযোগ্য সম্পদ (Non-renewable resources)

(ক) নবীকরণযোগ্য সম্পদ ঃ নবীকরণযোগ্য সম্পদসমূহ অফুরন্ত এবং সেগুলোকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনর সৃষ্টি করা সম্ভব। যেমন— সৌর শক্তি, অরণ্য, বনজ সম্পদ ইত্যাদি। অবশ্য বহু নবীকরণযোগ্য সম্পদের দ্রুত পুনর সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না। ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার জন্য এই সম্পদসমূহ কমে যায়। যেমন— বনাঞ্চল, ভূগর্ভের জল ইত্যাদি।

(খ) নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ ঃ এই সম্পদসমূহ সীমিত পরিমাণে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। যেমন— কয়লা, পেট্রোলিয়াম, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির মত জীবাশ্ম ইন্ধন। যদি মানুষ একবার এই সম্পদসমূহ শেষ করে ফেলে তাহলে সেগুলো পুনর সৃষ্টি করা যায় না।

বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ

বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ হচ্ছে—

১। বনজ সম্পদ
২। জল সম্পদ
৩। ভূমি সম্পদ
৪। খনিজ সম্পদ
৫। খাদ্য সম্পদ
৬। শক্তি সম্পদ

১। বনজ সম্পদ ঃ বিশ্বের মোট ভূ-ভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে বনভূমি। এই সবুজ বনাঞ্চল আমাদের শুধু সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীরই যোগান দেয় না পরিবেশগতভাবেও আমাদের সাহায্য করে। গাছ থেকে আমারা কাঠ, জ্বালানি, খাদ্য-বস্তু, জীবজন্তুর খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি বহু বাণিজ্যিক সামগ্রী পাই। কিন্তু বনাঞ্চলসমূহ যেভাবে আমাদের পরিবেশগত সহায়তা করে তার কথা আমাদের স্বীকার করা উচিত। যেমন—

- পৃথিবীতে থাকা জীবসমূহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্যাস সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি করে থাকে সবুজ বনাঞ্চল।
- সালোক সংশ্লেষণের সময় সবুজ গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয় এবং গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধির সমস্যা হ্রাস করে।
- কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে প্রকাণ্ড বন্যপ্রাণী পর্যন্ত হাজার হাজার ধরণের জীবকে বনাঞ্চল আশ্রয় দেয়।
- বনাঞ্চল ভূমির ক্ষয় হ্রাস করে।
- বনাঞ্চল স্থানীয় জলবায়ুর অবস্থা এবং জলচক্র নিয়ন্ত্রণ করে।
- কিছু উদ্ভিদ বহু বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করে নেয় এবং প্রদূষণের সূচক হিসাবে কাজ করে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রধান কারণ ঃ-

১। কাষ্ঠ উদ্যোগ
২। বনাঞ্চলের কৃষিভূমিতে রূপান্তর হওয়া
৩। রাস্তা, সেতু ইত্যাদির নির্মাণ
৪। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা ভূমি দখল
৫। বনজ সম্পদের অবৈধ আহরণ
৬। বনাঞ্চলের বন্য জীব-জন্তুর চোরাশিকার।

প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ (Conservation of natural resources)

জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সম্পদ আহরণের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে কয়েক দশক পর অনেক মূল্যবান সম্পদ নিঃশেষিত হতে পারে। সংরক্ষণ হচ্ছে সম্পদের মিতব্যয়িতা এবং অপচয় না করে ব্যবহার করা। এটা হচ্ছে মাত্রাধিক ব্যয়, অপচয় এবং অসময়ে ব্যবহার এড়িয়ে চলার জন্য বিবেচনার মাধ্যমে করা সম্পদের ব্যবহার।

জল সম্পদ ঃ যেহেতু জল ছাড়া জীবন সম্ভব তাই জলকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যায়। আমাদের পৃথিবীর ৭৫ শতাংশই জল। তার মধ্যে ৯৭ শতাংশ নোনা এবং মাত্র ৩ শতাংশ পরিষ্কার জল। এই ক্ষুদ্র অংশের সর্বাধিক অংশ রয়েছে মেরু অঞ্চলের বরফের মধ্যে এবং মাত্র ০.০০৩ শতাংশ জল ভূগর্ভ এবং ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে থাকা জল হিসাবে আমরা পাই।

উত্তর-পূর্ব ভারতে জল সম্পদ (বিশেষত অসমে) ঃ

পরিষ্কার জল সম্পদের ক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব ভারত তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছে। অঞ্চলটিতে গড় হিসাবে বার্ষিক পৃষ্ঠভূমির তথা পরিষ্কার

জলের সম্ভাবনা ৫৮৫.৮ ঘন কিলোমিটার বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। যা ভারতের সমস্ত নদীতন্ত্রের মধ্যে সর্বাধিক এবং বিশ্বের মধ্যে পঞ্চম। তার মধ্যে ২৪.০ ঘন কিলোমিটার ব্যবহারের উপযোগী জল এবং ৪.১ শতাংশ বার্ষিক সম্ভাবনা থাকা মুক্ত জল। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বছরে গড়ে ২০০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয় এবং মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে সর্বাধিক ১১,০০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর উত্তর-পূর্বের মানুষ কোনো কোনো সময় খরা তথা জলের সংকটে ভোগেন। কোনো অঞ্চলের ভূমি পরিকাঠামোও জল ধরে রাখতে পারে না, শীঘ্রই বয়ে যায় এবং যখন বৃষ্টি হয় না তখন ঝরনা এবং নালা-নর্দমা শুকিয়ে যায়।

শুধু সমতলভূমিতেই ভূ-গর্ভের জলের পরিমাণ বেশি। কম গভীর এবং গভীরতায় থাকা জল জলসেচ এবং শিল্পোদ্যোগের জন্য উপযোগী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের মধ্যে অসমে ভূ-গর্ভের জলের পরিমাণ বেশি যদিও এর মাত্র ১২.৮৩ শতাংশ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। মণিপুরের ভূ-গর্ভের জলের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৩,১৫৩.৬৭ নিযুত ঘন মিটার। এবং তার মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে ২৬৮০.৬১ নিযুত ঘন মিটার। কিন্তু কিছু এলাকার জলে লোহার (Iron) পরিমাণ বেশি। সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এবং মণিপুরে কিছু এলাকার জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ধারিত হয়েছে। অসমের কার্বি আংলং, নগাঁও এবং কামরূপ (মেট্রো এবং গ্রামীণ) জেলার কিছু কিছু এলাকার জলে ফ্লোরাইডের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

ব্রহ্মপুত্রসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বহমান নদীগুলোর উৎস হচ্ছে হিমালয়ের হিমবাহ। এই নদীসমূহ এবং তাদের কয়েকশ উপনদী হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিষ্কার জলের উৎস। উত্তর-পূর্ব ভারতে বৃহৎ পরিমাণের আর্দ্রভূমি রয়েছে। ৩৫০০ টিরও বেশি আর্দ্রভূমি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ৫২,৯৫৯ হেক্টর এলাকা গ্রাস করে রেখেছে। এই অঞ্চলে ভারতের একটি বৃহত্তম পরিষ্কার জলের উৎস লকতাক হ্রদ (৬,৪৭৫ হেক্টর) রয়েছে। বরাক উপত্যকায়ও রয়েছে বৃহৎ এলেকার বন্যাবিধৌত আর্দ্রভূমি যেখানে পাওয়া

যায় বিভিন্ন ধরণের জলজ উদ্ভিদ। সিকমে ১০ টিরও বেশি প্রাকৃতিক হ্রদ রয়েছে।

জলের সংরক্ষণ ঃ

জল হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান এবং অপরিহার্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে একটি। যার সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করা উচিত। এই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যায়—

১। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ
২। জল বয়ে যাওয়া প্রতিরোধ
৩। শুকিয়ে যেতে বাধাদান
৪। জলের পুনর্ব্যবহার
৫। জলের অপচয়ে বাধাদান
৬। জলপ্রদুষণ নিয়ন্ত্রণ
৭। কঠোর আইন বলবৎ করা
৮। সচেতনতার কর্মসূচি গ্রহণ

ভূমি সম্পদ ঃ জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন খাদ্য, বস্ত্র এবং জ্বালানির জন্য নির্ভর করতে হয় ভূমির ওপর, যা এক প্রকার সীমিত এবং মূল্যবান সম্পদ। এক ইঞ্চি বা ২.৫ সেন্টিমিটার মাটি তৈরির জন্য প্রায় ২০০-১০০০ বছর প্রয়োজন।

ভূমি ক্ষয়ের কারণসমূহ ঃ

১। ভূমি ক্ষয় ঃ উপরি পৃষ্ঠের মাটির ক্ষয়
২। জল জমা হওয়া ঃ মাটির তলায় অত্যধিক জল জমা হওয়া
৩। লবণাক্ত হওয়া ঃ সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম দ্রব লবণ জমা হয়ে মাটির উর্বরতায় প্রভাব
৪। কঠিন মৌল (ধাতু), কীটনাশক দ্রব্য, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ঔদ্যোগিক বর্জিত পদার্থের মাটিতে মিশে যাওয়া।

ভূমি সম্পদের সংরক্ষণ ঃ

১। পাহাড়ি বা ঢালু স্থানে বৃক্ষরোপণ করে ভূমির অবক্ষয় হ্রাস করা যায়।

২। কীটনাশক দ্রব্য এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং জৈবিক সারের প্রয়োগকে উৎসাহ প্রদান।

৩। ঔদ্যোগিক বর্জিত পদার্থসমূহ যথার্থভাবে ফেলার ব্যবস্থা করা।

৪। একেকটি অঞ্চলে পরম্পরাগত শস্যের চাষে উৎসাহ প্রদান।

খনিজ সম্পদ ঃ

খনিজ দ্রব্যসমূহ হচ্ছে নির্দিষ্ট রাসায়নিক উপাদান এবং লক্ষণীয় ভৌতিক গুণাগুণ তথা প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া অজৈব (স্ফটিক) গোটা পদার্থ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবসময় ব্যবহার করা খনিজ পদার্থসমূহ হচ্ছে লোহা, কয়লা, জিংক ইত্যাদি। ঔদ্যোগিক প্রকল্প, যন্ত্রপাতি, কয়লা, ইউরেনিয়াম দিয়ে শক্তির উৎপাদন, নির্মাণকার্য, গয়না তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে এগুলোকে ব্যবহার করা হয়।

খনিজ দ্রব্যসমূহ তিন প্রকারের হতে পারে—

১। ধাতব খনিজ পদার্থ। যেমন— বক্সাইট, কপার পাইরাইটস, হিমেটাইট, গেলেনা, জিংক ব্লেন্ড ইত্যাদি।

২। অধাতব খনিজ পদার্থ; যেমন— গ্রাফাইট, হীরা, কোয়ার্ট্জ, ফেল্ড্স্পার ইত্যাদি।

৩। শক্তি উৎপাদনকারী খনিজ দ্রব্য; যেমন— কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং ইউরেনিয়াম।

ভারতের খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তার ব্যবহারে উন্নত ঔদ্যোগিক প্রকল্পসমূহ গড়ে তোলা সম্ভব। আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ,

ক্রমাইট এবং টাইটেনিয়ামের মতো লৌহজাতীয় ধাতব খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারত যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ এবং তামা, সিসা, টিন, গ্রাফইট, জিংক ইত্যাদি অলৌহ জাতীয় ধাতব পদার্থের ভাণ্ডার যথেষ্ট নয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতের খনিজ সম্পদ (বিশেষত অসমের)

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলটি হচ্ছে বিভিন্ন খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। মেঘালয় ইউরেনিয়াম, কয়লা এবং চুনাপাথরের জন্য বিখ্যাত। খনিজ সম্পদের জন্য অসম বহুলভাবে পরিচিত রাজ্য। এখানে প্রধানত পেট্রোলিয়াম (অপরিশোধিত তেল), প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং চুনাপাথর আহরণ করা হয়। তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আয়োগ (ONGC) হচ্ছে রাজ্যের সবচেয়ে লাভজনক সরকারি খণ্ডের প্রতিষ্ঠান। সেলিমেনাইট, বেসমেটাল, কেরিল, নির্মাণ সামগ্রী, এসবেস্টস, ফায়ার ক্লে, কেয়লিন, ফুলার্স আর্থ, মাইকা, কোয়ার্ট্জ, ডলোমাইট ইত্যাদি বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য অসমে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত খনিজের বেশির ভাগই বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হয়ে ওঠেনি। অসমের সুবনসিরি নদী থেকে উনিশ শতকের আগে থেকেই সোনা আহরণ করা হচ্ছে।

প্রশ্নাবলি

১। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বোঝ?

২। প্রাকৃতিক সম্পদ কী কী ধরণের হতে পারে?

৩। নবীকরণযোগ্য এবং নবীকরণঅযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ কী? উদাহরণ দাও।

৪। সবুজ গাছের পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

৫। অসমের জাতীয় উদ্যানসমূহের নাম লেখ।

৬। অসমের পাঁচটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের নাম লেখ।

৭। মণিপুরের বৃহৎ আর্দ্রভূমিটির নাম লেখ।

৮। ভূমিসম্পদ রক্ষার দুটি পারম্পরাগত পদ্ধতির নাম লেখ।

৯। উত্তরপূর্ব ভারতের খনিজ সম্পদসমূহের বিষয়ে লেখ।

১০। জল সংরক্ষণের কয়েকটি ব্যবস্থার বিষয়ে উল্লেখ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

পরিবেশ প্রদূষণ

পরিবেশ অবক্ষয় এবং প্রদূষণের বৃহৎ সমস্যার সঙ্গে আজকের পৃথিবীর সংঘাত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের প্রদূষণ, দ্রুত বনজ সম্পদ ধ্বংস, জন বিস্ফোরণ, শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, খনিজ পদার্থ আহরণ, ভূমি ক্ষয় ইত্যাদি বিগত বছরগুলোতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানুষের যে প্রবণতা, তা-ই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চলা নির্বিচার লুণ্ঠনের কারণ।

মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ প্রদূষণ সমস্যাটি শুরু হয়েছিল। প্রাচীন উপাখ্যানে বর্ণিত আদম এবং ইভ যখন একটা আপেল খেয়ে তার খোসা ছুড়ে ফেলেছিল, তখন থেকেই পরিবেশ প্রদূষণ শুরু। ঔদ্যোগীকরণ, নগরায়ন, পরিবহণ ব্যবস্থা, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদূষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বর্ধিত জনসংখ্যা, খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য উপভোগ্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির ফলেই ব্যাপক হারে পরিবেশ ধ্বংস শুরু হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব জল ব্যবস্থা, ভূমি, বাতাস ইত্যাদির সহ্যক্ষমতায় আঘাত হানে। প্রথম অবস্থায় বিজ্ঞান এবং পরিবেশ প্রদূষণের সমস্যাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়ন এবং অভূতপূর্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুত পরিবর্তন পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের গুণাগুণ এবং পরিমাণ দুটোর ওপরই প্রভাব বিস্তার করে। অপ্রতিরোধ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সীমিত সম্পদের ব্যবহারও প্রচুর বৃদ্ধি পায়। এরজন্য সৃষ্টি হ'ল পরিবেশ প্রদূষণ। তদুপরি মানব জাতির অতি বিষয়লিপ্ত, এবং বিলাসী জীবন প্রবাহের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করতে শুরু করে।

প্রদূষণ ঃ ল্যাটিন শব্দ Pollutionem (পলিউশনেম যার অর্থ অপরিষ্কার) এর থেকে Pollution (প্রদূষণ) শব্দটি এসেছে। মানুষের কার্যকলাপের ফলে আমাদের পরিবেশে যে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটেছে তাকে বোঝার জন্যই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। মোটকথা প্রদূষণ হচ্ছে বাতাস, জল এবং ভূমির ভৌতিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক গুণাগুণের অবাঞ্ছিত পরিৱর্তন যা মানুষ, জীবজন্তু, অন্যান্য জীব এবং সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে

বিভিন্ন প্রকারের প্রদূষণ ঃ

১। পরিবেশ অনুসারে পরিবেশের বিভিন্ন অংশ প্রদূষণে আক্রান্ত হলে সেগুলিকে এভাবে ভাগ করা যায়—

ক) বায়ু প্রদূষণ (Air Pollution)
খ) জল প্রদূষণ (Water Pollution)
গ) ভূমি প্রদূষণ (Soil Pollution)

২) প্রদূষক অনুসারে— প্রদূষক অনুসারে প্রদূষণ নিম্ন প্রকারের হতে পারে—

ক. তাপ প্রদূষণ (Thermal pollution)
খ. শব্দ প্রদূষণ (Noise Pollution)
গ. তেজস্ক্রিয়তা প্রদূষণ (Radioaction Pollution)
ঘ. গোটা আবর্জনার প্রদূষণ (Solid waste Pollution)
ঙ. তৈল প্রদূষণ (Oil Pollution)
চ. ঔদ্যোগিক প্রদূষণ (Industrial Pollution)
ছ. সাগরীয় প্রদূষণ (Marine Pollution)

প্রদূষক এবং ক্ষতিকারক দ্রব্য

প্রদূষক ঃ মানুষের কার্যকলাপের ফলে প্রকৃতিতে এই ধরণের পদার্থের উপস্থিতি স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় এবং তা পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, লেড, কেডমিয়াম ইত্যাদি।

প্রদূষকের শ্রেণিবিভাগ ঃ

প্রদূষক দুই ধরণের হাতে পারে— নির্গত হওয়ার পর প্রদূষকসমূহ কীভাবে থাকে তার ওপর ভিত্তি করে মুখ্য এবং গৌণ প্রদূষক হিসাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

মুখ্য প্রদূষক ঃ এই প্রদূষকসমূহ একপ্রকার চিহ্নিত করতে পারা উৎস থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্গত হয় এবং পরিবেশে উপস্থিত থাকে।

উদাহরণ ঃ সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি।

গৌণ প্রদূষক ঃ এই প্রদূষকসমূহ সৃষ্টি হয় মুখ্য প্রদূষকসমূহ থেকে। রাসায়নিক বিক্রিয়া বা প্রাকৃতিক কারণে এই প্রদূষকের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ— সূর্যের আলোয় হাইড্রোকার্বন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটে পেরোক্সি এসিটাইল নাইট্রেট (PAN) গৌণ প্রদূষক সৃষ্টি হয়।

ক্ষতিকারক দ্রব্য ঃ ক্ষতিকর দ্রব্য হচ্ছে মানুষের কার্য-কলাপের জন্য পরিবেশে মিশে থাকা দ্রব্য যা স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিতে থাকে না। ক্ষতিকারক দ্রব্য (Contaminant)ও একপ্রকার প্রদূষক। যেমন— ক্লরোফ্লরো কার্বন থেকে ফ্লরিন, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য মেশানো পদার্থ, রং ইত্যাদি।

পরিবেশ প্রদূষণের কারণসমূহ ঃ

প্রাকৃতিক	ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির উদগীরণ, অত্যধিক বৃষ্টিপাত (বন্যা), ভূমিস্খলন, ঝড়, পাথরের অবক্ষয় ইত্যাদি
মানুষের কার্যকলাপ	জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনাঞ্চল ধ্বংস, ঔদ্যোগিক এবং যানবাহন থেকে সৃষ্ট সমস্যা, জীবাশ্ম ইন্ধনের প্রজ্বলন, যুদ্ধ, নির্মাণ কার্য ইত্যাদি।

বায়ু প্রদূষণ

ধুলো, ধোঁয়া, কুয়াশা, দুর্গন্ধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বা বায়ুতে মিশে থাকা কণা (SPM) ইত্যাদি এক বা একাধিক প্রদূষক বা অনিষ্টকারী পদার্থ বায়ুমণ্ডলে মিশে থাকাটা মানুষ, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য ক্ষতিকারক হয়ে পরা এবং জীবন-সম্পত্তির স্বাভাবিক উপভোগে বাধার সৃষ্টি হওয়াটাই বায়ু প্রদূষণ। বায়ু প্রদূষণকে পৃথিবীর জীবজগতের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলা বায়ুর অসম গুণ বলে উল্লেখ করা যায়। যে পরিমাণ এবং যে সময়ের জন্য

বায়ুতে এক বা একাধিক পরিমাণের অনিষ্টকারী দ্রব্যের উপস্থিতি স্বাস্থ্য এবং জনকল্যাণের জন্য ক্ষতিকর তাকে বায়ু প্রদূষণ বলা যায়।

বায়ু প্রদূষণের উৎসসমূহ ঃ

প্রকৃতিতে বায়ুকে কখনও শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। আদিম মানুষ যখনই আগুনের ব্যবহার শিখেছিল সেদিন থেকেই বায়ু প্রদূষণ শুরু হয়। বায়ু প্রদূষণের প্রধান উৎসসমূহ এই প্রকারের হতে পারে—

১) প্রাকৃতিক উৎস

(ক) আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ ঃ সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন।

(খ) দাবানল ঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে সারা বছর দাবানল বা বনে আগুন জ্বলার ঘটনা ঘটে থাকে। এই অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রচুয় পরিমাণে ধোঁয়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বাতাসে মিশে যায়।

(গ) জৈবিক এবং অজৈবিক দ্রব্যের স্বাভাবিক এবং গলে পচে যাওয়া ঃ মিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস বাতাসে মিশে যায়।

(ঘ) ধুলো ঃ বিভিন্ন পরিমাণের ধূলি সবসময় বায়ুমণ্ডলে মিশে থাকে।

(ঙ) ফুলের রেণু ঃ বসন্ত কালে ফুলের রেণু উৎপত্তি হওয়ার সময় বাতাসে মিশে গিয়ে বায়ু প্রদূষণ হয়। অপতৃণ, ঘাস-বন এবং গাছ-বৃক্ষের রেণু বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এই সমস্ত থেকে এলার্জি হয়।

(চ) অণুজীব ঃ ব্যাক্টেরিয়া, ইস্ট, ইত্যাদির মতো ক্ষুদ্র অণুজীব বিভিন্ন ধরণের কণিকা হিসাবে বায়ুমণ্ডলে মিশে থাকে।

(ছ) তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং বহির্জগত থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মি বায়ুমণ্ডলে থাকা গ্যাসীয় পদার্থসমূহের সঙ্গে ক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়।

বায়ু মণ্ডলের নিম্নস্তরে হওয়া প্রাকৃতিক-রাসায়নিক বিক্রিয়া-ই জারণ, বিজারণ, সংযোজন, দহন, ঘনীভবন এবং বহুযোগিকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস, বা জলীয় বাষ্পকে কঠিন এবং তরল পদার্থে রূপান্তর করে। বায়মুণ্ডলের উচ্চ স্তরে আলোক রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চ শক্তির অতি বেগুনি রশ্মি বিকিরণ শোষণ করে অধিক জটিল অণু সৃষ্টি করে।

২। মানুষের সৃষ্ট উৎসসমূহ ঃ

(ক) বনাঞ্চল ধ্বংস

(খ) যান-বাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া

(গ) জীবাশ্ম ইন্ধনের দহন

(ঘ) দ্রুত শিল্পায়ণ

(ঙ) আধুনিক কৃষি কার্য।

(ক) বনাঞ্চল ধ্বংস ঃ বনাঞ্চলসমূহ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একটি সবুজ আবরণে পৃথিবীকে ঢেকে থাকা এই অরণ্যসমূহ শুধু অসংখ্য সামগ্রীই উৎপাদন করে না, জীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যও সম্পাদন করে। কিন্তু উদ্বেগের কথা যে প্রত্যেক স্থানে ব্যাপক হারে অরণ্য ধ্বংস চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি জুম চাষ, ইন্ধনের প্রয়োজনীয়তা, শিল্পের কাঁচা সামগ্রী, উন্নয়নমূলক প্রকল্প, খাদ্যের বর্ধিত চাহিদা, গরু-মোষেয় বিচরণ বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে বনাঞ্চল ধ্বংসকার্য তীব্র গতিতে চলছে এবং তার পরিণতিতে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, জৈববৈচিত্র্যের হ্রাস ইত্যাদি সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে।

যান-বাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া ঃ যান-বাহন সৃষ্ট প্রদূষণ হচ্ছে সবচেয়ে বিপদজনক বায়ু প্রদূষণ। কঠোর আইন প্রবর্তন, নতুন মান নির্ণয়, ইন্ধনের গুণাগুণ পরিবর্তন করা, যানবাহনের উন্নত মডেল ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও যান-বাহনের প্রদূষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যান-বাহন থেকে নির্গত প্রধান প্রদূষকসমূহ হচ্ছে—

কার্বন মনোক্সাইড (CO)
হাইড্রোকার্বন (HC)
নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO_x) এবং

বায়ুতে ভেসে থাকা কণিকা (SPM)

পেট্রোলিয়াম চালিত যানসমূহে পলিনিউক্লিক এরোমেটিক হাইড্রোকার্বন এবং কিছু এলডিহাইড নির্গত করে। ইন্ধনে থাকা সালফার উপাদান সাপেক্ষে যান-বাহন থেকে বিভিন্ন পরিমাণের সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) নির্গত হয়। তদুপরি পেট্রোলচালিত যান-বাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া ইত্যাদিতে সিসার কণাও থাকে। পেট্রোলে টেট্রাইথাইল লেড থাকার ফলে কখনও ধোঁয়ার সঙ্গে সিসার যৌগও নির্গত হয়। ডিজেল চালিত যান-বাহনসমূহে প্রধানত নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO_x) এবং বায়ুতে ভেসে থাকা কণা (Suspended Particulate Matter) নির্গত করে।

যান-বাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া থেকে হওয়া প্রদূষণ নির্ভর করে—

- ইন্ধনের গুণাগুণ
- ব্যবহৃত ইঞ্জিনের প্রকার
- দহনের দক্ষতা
- বাহনের বয়স
- যান-বাহনের জট
- রাস্তার শোচনীয় অবস্থা
- বাহনের পুরনো প্রযুক্তি

যান-বাহনের প্রদূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ঃ

☐ ইন্ধনের গুণমান উন্নত করা এবং পরিষ্কার ইন্ধনের ব্যবহার

☐ বাহনের ইন্ধনে সিসার উপস্থিতি হ্রাস করা

☐ যান-বাহনের ধোঁয়া নির্গমন মাত্রা হ্রাসের জন্য নীতি-নিয়ম বলবৎ করা।

☐ উন্নত সড়ক ও যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা

☐ অন্তর্দহন ইঞ্জিনের উন্নতিকরণ।

জীবাশ্ম ইন্ধনের দহন ঃ

শিল্পে শক্তির জন্য কয়লা, কাঠ এবং পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মতো জীবাশ্ম ইন্ধনের আবশ্যক বা মেশিন চালনা এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে

প্রয়োজন হয়। এই ইন্ধনসমূহ সঠিকভাবে না জ্বলার ফলে ধোঁয়া উৎপন্ন হয়, যেখানে থাকে-

☐ ১০০ মাইক্রন আকারের চেয়েও ক্ষুদ্র কণা। এইসমূহ হচ্ছে— কার্বন কণা, ধাতব ধূলিকণা, রেজিন, আলকাতরা, এরোসোল, গোটা অক্সাইড, সালফেট, নাইট্রেট ইত্যাদি।

☐ ২০০ মাইক্রন ব্যাস থেকেও বড়ো কণা

☐ নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড

☐ হেলোজেন

☐ তেজস্ক্রিয় পদার্থ

ইন্ধন প্রজ্বলনের প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছে যান-বাহন, তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, ঔদ্যোগিক কাজকর্ম ইত্যাদি। বর্তমান বায়ুমণ্ডলে থাকা দুই তৃতীয়াংশ সালফার ডাইঅক্সাইড এই তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহে জ্বালানো কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি জীবাশ্ম ইন্ধনসমূহ থেকে নির্গত হয়।

দ্রুত শিল্পায়ন

রাসায়নিক প্রকল্প, ধাতব পদার্থ নির্মাণকারী প্রকল্প, স্মেল্টার, কাগজ কল, সূতা এবং কাপড়ের মিল, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, সাংশ্লেষিক রাবার উৎপাদন প্রকল্প ইত্যাদির মতো উদ্যোগ থেকে ২০ শতাংশ বায়ু প্রদূষণ হয়। বিভিন্ন কারখানা এবং খনিসমূহে সমগ্র পৃথিবীতে দৈনিক হাজার হাজার কর্মী বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকারক এবং বিষাক্ত পদার্থের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সিলিকোসিস, ভ্রূণের বিকৃতি, পক্ষাঘাত, চামড়ার এলার্জি, নিউমোকোনিওসিস ইত্যাদি রোগে ভোগে। বস্ত্র উদ্যোগে শ্রমিকরা নিশ্বাসের সঙ্গে তুলার কণা গ্রহণ করে। আটা মিলে শ্রমিকরা ক্রমাগত গমের কণা, এসবেস্টস তৈরির কারখানায় সিলিকার ধূলিকণা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে।

উদ্যোগ থেকে হওয়া বায়ু প্রদূষণ

বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের আধারপাত্র ঃ

গাছ-বনের সঙ্গে মহাসাগরসমূহ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধারপাত্র (sink)। আধারপাত্র হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যা বহুদিন ধরে থাকা প্রদূষককে ধরে রাখে এবং প্রয়োজন না হ'লেও অনির্দিষ্টভাবে তার সঙ্গে ক্রিয়া করে। ট্রপোস্ফিয়ারের বিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে থাকা গ্যাসসমূহের জন্যে মহাসাগর হলো আধারপাত্র। সাগরের পৃষ্ঠভাগের তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে গিয়ে সাগরে জমা হয়। গাছ-বৃক্ষসমূহও (vegetation) বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসসমূহ গ্রহণে সক্ষম। কিছু কিছু উদ্ভিদ কিছু কিছু গ্যাসের সঙ্গে ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রদূষকসমূহের গাঢ়তা এমন একটা অবস্থায় নিয়ে যায় যাতে পরবর্তী পর্যায়ে তা শোষিত হওয়ার অবস্থায় আসে। এইসমূহ ছাড়াও আরও কিছু আধারপাত্রও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ চুনাপাথর বায়ুমণ্ডলীয় অম্লসমূহের (acids) আধারপাত্র হিসাবে কাজ করে। বেশিরভাগ কার্বন মনোক্সাইডের আধারপাত্র হচ্ছে মাটিতে থাকা কিছু অণুজীব।

বায়ু প্রদূষণের শ্রেণি বিভাগ

বায়ু প্রদূষক (air pollutants) সমূহকে সাধারণত নিম্নে উল্লিখিতভাবে ভাগ করা হয়।

প্রদূষক	উপশ্রেণি	উদাহরণ
১. গ্যাস (অজৈব)	নাইট্রোজেনের অক্সাইড	নাইট্রিক অক্সাইড (NO), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2)
	সালফার অক্সাইড	সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) সালফার ট্রাই অক্সাইড (SO_3)
	কার্বনের অক্সাইড, অন্যান্য অজৈব যৌগ	কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) কার্বন মনোক্সাইড (CO) হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), এমোনিয়া, ক্লোরিন ইত্যাদি
২. কণা	কঠিন গ্যাস	ধূলি, ধোঁয়া, ফিউমস্ ছাই কুয়াশা, স্প্রে (Spray)

ঘরের বাইরের বায়ু প্রদূষক ঃ

- ☐ সর্বাধিক পরিমাণে প্রদূষকের উৎস হচ্ছে যান-বাহন
- ☐ সংশ্লিষ্ট বেশিভাগ রাসায়নিক পদার্থ
- ☐ বিভিন্ন কণা
- ☐ সালফার ডাইঅক্সাইড
- ☐ কার্বন মনোক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড
- ☐ ওজোন
- ☐ সিসা

ঘরের ভিতরের প্রদূষক ঃ

বিভিন্ন উদ্যোগের ভেতরে হওয়া প্রদূষণ একটি বড়ো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা এখন ঘরের ভেতরে এবং শহরাঞ্চলের কার্যালয়সমূহের ভেতর হওয়া প্রদূষণও গুরুতর হয়ে উঠেছে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র (air conditioner), গ্যাস স্টোভের ধোঁয়া, নির্মাণ সামগ্রী, আসবাব পত্র, ফটোকপি ইত্যাদির জন্যে এলার্জি, হাপানি, চামড়া এবং ফুসফুসের রোগ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ হয়। গ্যাস স্টোভ থেকে নির্গত নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস দীর্ঘদিন গ্রহণ করার ফলে ফুসফুসের ক্ষতি হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগে শরীর আক্রান্ত হয়।

বিভিন্ন কাগজের সামগ্রী, কার্পেট, মেঝের আবরণ, আঠা জাতীয় পদার্থ, রেজিন ইত্যাদি থেকে নির্গত ফর্মেলডিহাইড জাতীয় উদ্বায়ী জৈব যৌগ (VOC) এর জন্য নাসিকা পর্দার ক্ষতি হয়, অবসাদ আসে এবং মাথা ব্যথা হয়।

বায়ু প্রদূষক, তাদের উৎস এবং মানুষের ওপর প্রভাব

বায়ু প্রদূষক	উৎপাদনের উৎস	মানুষের ওপর প্রভাব
১. সালফার ডাইঅক্সাইড	কয়লা এবং তেলের দহন	বুক জ্বালা, মাথা ব্যথা, বমি, শ্বাসজনিত কারণে মৃত্যু ইত্যাদি।
২. নাইট্রোজেন অক্সাইড	কয়লার দহন, যান-বাহনের ধোঁয়া, নিম্নমানের গ্যাস স্টোভ, কেরোসিনের হিটার, স্টোভ	মাথাব্যথা, ফুসফুসের রোগ, শিশুর কাশি। ধূলি-ধোঁয়া ফুসফুসে প্রবেশকরার ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়।
৩. কার্বন মনোক্সাইড	কয়লা জ্বালানো, গ্যাসোলিন, মোটরের ধূলি-ধোঁয়া, নিম্নমানের চুলা, গ্যাস স্টোভ, কেরোসিনের হিটার, খরি বা কাঠ জ্বলানো।	বমির প্রবণতা, রক্তে অক্সিজেন সঞ্চারণ হ্রাস মাথা ব্যথা, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন
৪. এসপিএম ছাই, কালো ধোঁয়া ইত্যাদি	ইন্সিনিরেটর এবং প্রত্যেক কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া	চোখ জ্বালা করা, এগজিমা, কর্কট রোগ ইত্যাদি।

৫. হাইড্রোজেন সালফাইড	শোধানাগার, রাসায়নিক উদ্যোগ, বিটুমিনাস ইন্ধন	বমির প্রবণতা, চোখ জ্বলা, গলা চুলকানো ইত্যাদি।
৬. এমোনিয়া	বিস্ফোরক পদার্থ, রং করা কার্য, সারের কারখানা	শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগ আক্রান্ত হয়
৭. ফসজিন বা কার্বনিল ক্লোরাইড	রাসায়নিক দ্রব্য এবং রং করা কার্য	কাশি, গলা চুলকানো এবং হৃদরোগ
৮. এলডিহাইড	তেল, চর্বি বা গ্লাইকোলের তাপ বিয়োজন	নাসিকা এবং শ্বাস নলীতে জ্বালা-পোড়া অনুভব।
৯. বাতাসে ভেসে থাকা বিভিন্ন কণা	ইথিনিরেটর এবং প্রত্যেক কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া	অ্যাস্ফিসেমা, চোখ জ্বলা, কর্কট রোগ
১০. এসবেস্টস	পাইপ ইন্সুলেসন, ভিনাইল সিলিং, ফ্লোর টাইলস	ফুসফুসের রোগ, ফুসফুসের কর্কট

বায়ু প্রদূষণের প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ঃ

রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের বিরূপ প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্যে রসায়নবিদদের এক মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকরণে জড়িত হতে, রাসায়নিক পদার্থসমূহ সংশ্লেষণ করতে এবং কিছু নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞানীদের নিম্নে উল্লেখিত দিকগুলো ভেবে দেখতে হবে—

☐ চূড়ান্ত দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করা প্রক্রিয়ার সমস্ত পদার্থের চূড়ান্ত মিশ্রণের জন্যে সংশ্লোষিত পদ্ধতি নির্ণয় করা উচিত।

☐ সম্ভাব্য দ্রব্য উৎপাদন করতে এই সংশ্লোষিত পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত যাতে এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের সামান্য ক্ষতি হয় বা কোনো বিষাক্ত দ্রব্য ক্রিয়া না করে।

☐ বর্জিত পদার্থ শোধন বা পরিষ্কার করার চেয়ে সৃষ্টি হওয়ার আগেই সেগুলোকে বাধা দান বেশি ভাল।

☐ সহায়ক (auxilary) দ্রব্যসমূহ যেমন দ্রাবক, পৃথকীকরণ দ্রব্য ইত্যাদি যথাসম্ভব ব্যবহার না করা।

☐ শক্তির প্রয়োজন যথাসম্ভব হ্রাস করতে হবে।

☐ উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল ক্ষয় হতে দেওয়ার চাইতে পুনর ব্যবহারযোগ্য বা নবীকরণীয় হতে হবে।

☐ বিশেষত ঔদ্যোগিক প্রকল্পের স্থানে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা উচিত।

☐ কম প্রদূষণ ছড়ানো ইন্ধন ব্যবহার করা উচিত।

☐ শক্তির প্রচলিত উৎসের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা উচিত।

☐ যেকোনো উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশজনিত প্রভাবের অধ্যয়ন হতে হবে।

☐ কঠোর নীতি-নিয়ম বায়ু প্রদূষণ প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে।

জল প্রদূষণ ঃ

বিভিন্ন ধরণে জল প্রদূষণকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায়—

☐ মানুষ এবং অন্যান্য জলজ জীবের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করা জলের ভৌতিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক গুণাগুণের পরিবর্তন।

☐ জলে অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত দ্রব্য মিশে গিয়ে মানুষ, জীবজন্তু এবং

জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকারক হয়ে পরা অথবা সেই জলভাগ বা তার চারপাশে থাকা বিভিন্ন জীবিত পদার্থের স্বাভাবিক কার্যকলাপ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়া।

জলপ্রদূষণের উৎস ঃ

নিম্নে উল্লেখিত উৎসসমূহ জলপ্রদূষণের উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়েছে—

(ক) ঘরোয়া আবর্জনা
(খ) ঔদ্যোগিক বর্জিত পদার্থ
(গ) কৃষি আবর্জনা
(ঘ) শহরাঞ্চল থেকে বয়ে যাওয়া আবর্জনা
(ঙ) দ্রবণীয় বর্জিত পদার্থ
(চ) তেল গাড়িয়ে পরা
(ছ) আবর্জনার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা নোংরা জল
(জ) আবর্জনার স্তূপ
(ঝ) গোটা আবর্জনা
(ঞ) তাপবিদ্যুৎ প্রদূষক
(ট) তেজস্ক্রিয় পদার্থ
(ঠ) ক্ষুদ্র অপদ্রব্য এবং বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস
(ড) সংক্রামক দ্রব্য ইত্যাদি

উদ্যোগের বর্জ্য পদার্থের থেকে হওয়া জল প্রদূষণ

পানীয় জলের সঙ্গে জড়িত সমস্যা ঃ

খাওয়া, রান্নাবাড়া, স্নান, পরিষ্কার করা, বাগান করা, জলসেচ, উদ্যোগ এবং অন্যান্য বহু কাজে মানুষের জলের দরকার। বিভিন্ন কাজকর্মে বহুলভাবে ব্যবহৃত জলের গুণাগুণ ভিন্ন-ভিন্ন হয় এবং একটি কাজে ব্যবহৃত জলের সঙ্গে অন্য কাজে ব্যবহৃত জল এক নাও হতে পারে। পানীয় জলকে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে মুক্ত হতে হবে। যদি জলে বেশি গ্যাস থাকে, বেশি রঙিন হয় এবং আপত্তিজনক স্বাদের হয় তাহলে সেই পানীয় জলের নমুনাকে সাধারণত বাতিল করা হয়। কিন্তু জলের এই সমস্ত বিরূপ গুণসমূহ না থাকলেও সেই জলকে খাওয়ার জন্য নিরাপদ বলা যাবে না। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক ঔদ্যোগিক কার্যকলাপ, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ইত্যাদির সৃষ্ট প্রচণ্ড চাপের ফলে নির্গত বহুল পরিমাণের প্রদূষক বিভিন্ন উৎসের জলে মিশে গেছে। ফলে শুধু বিশুদ্ধ জল খাওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে ধারণা প্রবল হলেও এই ধরণের জলের যোগান অত্যন্ত সীমিত।

ঘরোয়া বর্জ্য পদার্থ এবং অন্যান্য আবর্জনা বা মানুষ এবং জীবজন্তুর দ্বারা বর্জিত পদার্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পানীয় জলে মিশ্রিত হয়ে দূষিত হওয়াটা বিশেষত তৃতীয় বিশ্বে জলের গুণাগুণের সঙ্গে জড়িত অতি সাধারণ এবং বহুব্যাপ্ত সমস্যা। বর্জ্য পদার্থ থেকে হওয়া প্রদূষণের ফলে ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, বিভিন্ন পরজীবীর মত আন্ত্রিক বীজাণুসমূহ শরীরে প্রবেশ করে এবং তা থেকেই গ্যাস্ট্রোএণ্ট্রাইটিস থেকে গুরুতর এবং মারাত্মক কলেরা বা টাইফয়েড পর্যন্ত বিভিন্ন রোগ হয়। তদুপরি ঘাঁ, জ্বর, মায়োকার্ডাইটিস, মেনেনজাইটিস, শ্বাসজনিত রোগ ইত্যাদি হতে পারে। জলের উৎসে বয়ে আসা ঘরোয়া বর্জ্য পদার্থ মিশে গেলে এমিবায়োসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস ইত্যাদি প্রটোজোয়া থেকে সৃষ্ট রোগ উৎপন্ন হয়।

কোনো দুর্ঘটনার জন্য জলের সঙ্গে যদি বৃহৎ পরিমাণের মিশ্রণ না হয় তাহলে রাসায়নিক দ্রব্য থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো গুরুত্বর স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রত জল গ্রহণ করে গেলে বিষাক্ত এবং ক্ষতিকারক দ্রব্যের জন্য ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

সাধারণত ভাবা হয় যে, অবাঞ্ছিত দ্রব্যই জলের রূপ, গন্ধ এবং স্বাদ পরিবর্তন করে এবং একজন মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই জলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করতে পারে। এই ধারণা এখন আর সত্য নয়। যদি উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করা না হয় তাহলে কোনো জলকে নিরাপদ বলে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু, বিশেষত পানীয় জলের ক্ষেত্রে এই ধরণের পরীক্ষা অসমে এখনও প্রাথমিক আবস্থায় রয়েছে। নিরাপদ পানীয় জল পাওয়াটা স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা মানুষের মৌলিক মানবধিকার এবং সমগ্র বিশ্ব স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গ্রহণ করা সমস্ত বিস্তৃত প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নের জন্য জল, শৌচাগার ইত্যাদি পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কিত প্রটোকলের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে।

জলে অপদ্রব্যের সংযোজন ঃ

পানীয় জলের সঙ্গে জড়িত সবচেয়ে বেশি এবং বিস্তৃত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাটি হচ্ছে ক্ষতিকর অণুজীব মিশ্রিত হওয়াটা এবং যার পরিণতি তাকে নির্দেশ দেয় যে তার নিয়ন্ত্রণ সর্বদা সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করা উচিত। কারণ প্রধান নাগরিক ব্যবস্থাসমূহ অণুজীবের দ্বারা দূষিত হলে জল থেকে সৃষ্ট রোগে জড়িয়ে পরার আশংকা থাকে। অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ এবং কৃষি আবর্জনা, ঔদ্যোগিক বর্জ্য পদার্থ, আবর্জনার স্তূপ, টেংকার থেকে তেল গড়িয়ে পরা, খনন কার্য ইত্যাদির মাধ্যমে পানীয় জলের উৎসে অপদ্রব্যের মিশ্রণ ঘটে।

দূষিত জল থেকে সৃষ্ট রোগ ঃ

মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ বা জীবজন্তুর শরীরের বর্জ্য পদার্থে যে সমস্ত রোগ সংক্রমণকারী অণুজীব থাকে সেগুলো মিশ্রিত হওয়া পানীয় জল গ্রহণ করলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। দূষিত জলের উৎস এবং শোচনীয় পুর জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ ছড়ায়। জলের গুণাগুণের দ্বারা ব্রিয়ারি, দুগ্ধ উৎপাদন প্রকল্প, রং করা উদ্যোগ, চামড়া উৎপাদন, কাপড় রং করা, জৈব প্রকল্প, কঠিন ধাতু ইত্যাদি প্রভাবিত হতে পারে। সাধারণত জল থেকে সৃষ্ট রোগসমূহ হচ্ছে—

ক) টাইফয়েড- সেলমনেলা টাইফি

খ) কলেরা- ভিব্রিও কলেরা

গ) ডিসেন্ট্রি— সিজেলা

ঘ) ডায়েরিয়া— ক্রিপ্টসপরিডিয়াম

ঙ) জিয়ারডিয়াসিস —জিয়ারডিয়া লেম্বলিয়া

চ) ডায়েরিয়া — ই-কলি

ছ) গ্যাস্ট্রো এণ্ট্রাইটিস— বিভিন্ন ভাইরাস

জ) পলিও — পলিও ভাইরাস

নিরাপদ জল ঃ

সঠিকভাবে রাসায়নিক পরীক্ষা না করা পর্যন্ত কোনো ধরণের পানীয় জলকে নিরাপদ বলা যায় না। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাসহ সমস্ত ধরণের ঘরোয়া কাজ-কর্মের জন্য নিরাপদ জল উপযুক্ত। মানুষের খাওয়ার জন্য প্যাকেজ জল ব্যবহার করা উচিত। কিছু বিশেষ ধরণের কাজ যেমন ডায়েলাইসিস (চিকিৎসা ক্ষেত্রে) কনট্যাক্ট ল্যান্স পরিষ্কার করা বা কিছু কিছু খাদ্য এবং ঔষধ তৈরিতে আরও উচ্চ মানের জলের আবশ্যক।

কোন জল খাওয়ার অনুপযুক্ত

পরিশোধন না করা জল খাওয়ার জন্য নিরাপদ নয়। পাকা কুয়া এবং টেপের জলে আপত্তিজনক স্বাদ, বেশি পরিমাণের গাদ, অতিরিক্ত লোহার উপস্থিতির ফলে যদি রঙীন হয় তাহলে তা খাওয়ার উপযুক্ত নয়। যদি জলের গুণের নির্ধারিত মাত্রা অনুমোদিত মাত্রার তুলনায় বেশি হয় তাহলে সে ধরণের জলও খাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আমরা কী করতে পারি?

সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও পানীয় জলের মান উন্নয়নে এই উল্লিখিত পরামর্শসমূহ গ্রহণ করা যায়। এই ব্যবস্থাসমূহ এত কম খরচ সাপেক্ষ যে নিম্ন আয়ের লোকও তা গ্রহণ করতে পারে।

(ক) বালি, পাথর এবং কয়লা ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে পরিচিত পরিশোধন ব্যবস্থার মাধ্যমে জল পরিশোধন করা উচিত।

(খ) বেশি ঘোলা এবং বেশি লোহা থাকা জলে ফিটকিরি ব্যবহার করতে হবে এবং বর্ষাকালে পরিশোধন ব্যবস্থা অধিক উন্নত করতে হবে।

(গ) ফুটিয়ে কঠিন জলকে কোমল জল করা যায়। এভাবে ব্যাক্টেরিয়ার মৃত্যু ঘটে।

(ঘ) ব্যাক্টেরিয়াজনিত প্রদূষণ হ্রাস করতে ক্লোরিন ব্যবহার করা উচিত।

(ঙ) জৈবিক শোধন দ্রব্য ব্যবহার করে জলকে ফ্লোরাইডমুক্ত করা পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

(চ) জল ফুটিয়ে খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ঃ

পানীয় জলের উৎস পরিষ্কার এবং নিরাপদ রাখতে এই ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা উচিত ঃ

(ক) স্থান ঃ শৌচাগার, বর্জ্য পদার্থের নালা, আবর্জনা ইত্যাদি থেকে জলের উৎস ন্যূনতম দশ মিটার থেকে পোনরো মিটার দূরে উঁচু স্থানে থাকা দরকার।

(খ) মঞ্চ ঃ টিউবওয়েল এবং পাকা কুয়ার চারদিকে প্রায় এক মিটার ওঁচু মঞ্চ বা আধার তৈরি করতে হবে এবং এই স্থানে জল যাতে জমা না হয় তার জন্য নানা তৈরি করতে হবে। পাকা মঞ্চটি বিকৃত বা ভগ্ন হওয়া উচিত নয়।

(গ) নালা ঃ অপরিষ্কার জল যাতে জমা না হয় তার জন্য জলের উৎসের আশ-পাশে নালার ব্যবস্থা সুন্দর হওয়া উচিত। এই স্থানে অতিরিক্ত জল ফেলা উচিত নয়।

(ঘ) আবরণ ঃ কোনো বাইরের বস্তু যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য পাকা কুয়ার মুখ ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করতে হবে।

(ঙ) লাইনিং ঃ বাইরের অপরিষ্কার জল এবং চারপাশে জমা হওয়া জল যাতে পাকা কুয়ায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য কুয়ার চারদিকে ছয় মিটার পর্যন্ত সিমেন্ট এবং পাথর দিয়ে তলাটা পাকা করাতে হবে।

ভূমি প্রদূষণ ঃ

পৃথিবীর একেবারে ওপরের অংশটিই হচ্ছে ভূমি বা মাটি। যা হচ্ছে জৈব পদার্থের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু পাথর এবং উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থের মিশ্রণ। মাটির গঠন হচ্ছে একটি জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। পাথরের গঠন এবং ক্ষয় আদির পরিণতিতে মাটির গঠন হয়েছে। এই ভূমি গঠন প্রক্রিয়া জৈব পদার্থসমূহের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসার ফলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের আকর সৃষ্টি হয়। মাটিতে ঘরোয়া এবং ঔদ্যোগিক বর্জ্য পদার্থসহ বিভিন্ন ধরণের জমা করা আবর্জনা, কৃষি ভূমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক দ্রব্য ইত্যাদির জন্য মাটি প্রদূষিত হয়। বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য মিশ্রিত হওয়ার ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়।

ভূমি প্রদূষণের উৎস ঃ

নীচে উল্লিখিত উৎসসমূহ ভূমি প্রদূষণের কারণ হতে পারে—

(ক) ঔদ্যোগিক বর্জ্য পদার্থ

(খ) নগরের আবর্জনা

(গ) কৃষি কার্য বা কৃষি-আবর্জনা

(ঘ) পুর আবর্জনা

(ঙ) তেজস্ক্রিয় প্রদূষক

(চ) জৈবিক দ্রব বা এজেন্ট

ভূমি প্রদূষণের প্রভাব ঃ

(ক) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত হয়ে থাকা ঔদ্যোগিক আবর্জনাসমূহ অতি বিষাক্ত। অম্ল, ক্ষার, কীটনাশক (অপতৃণনাশক, পতঙ্গনাশক, ইঁদুর নাশক ঔষধ), কঠিন মৌল ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থসমূহ মাটির উর্বরতা হ্রাস করে এবং সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করে।

(খ) কিছু কিছু বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ থাকে। বিভিন্ন অণুজীব মাটিতে লেগে থাকা গাছ, বন এবং প্রাণীর দেহে প্রবেশের সঙ্গে ওই সমস্ত মাটির উর্বরতা হ্রাস করে। এই রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে ঢুকে পরে এবং মানুষ ও প্রাণীর ক্ষতি করে।

(গ) ভেসে আসা ময়লার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র বীজাণু থাকে এবং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। জিয়ারডিয়াসিস, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদির মতো রোগ সংক্রমিত হয় ভূমি প্রদূষণের মাধ্যমে।

(ঘ) মাটিতে মিশ্রিত রাসায়নিক সার থেকে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে জলে এসে মিশ্রিত হয় এবং অক্সিজেন নষ্ট করে পরিবেশকে জীবের অনুপযোগী করে তোলে।

(ঙ) মাটিতে জমা করে রাখা তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাব অধিক জটিল। তার কারণ হচ্ছে রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থরিয়াম, প্লুটোনিয়াম ইত্যাদির মতো তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ হাজার হাজার বছর সক্রিয় হয়ে থাকে। তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ বৃহৎ পরিমাণের বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি করে এবং সেগুলোর উচ্চ নির্গত শক্তি থাকে যা জনস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুতর হুমকির সৃষ্টি করে।

ভূমি প্রদূষণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ

(ক) বিভিন্ন উদ্যোগের বর্জ্য পদার্থসমূহকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার আগে সেগুলোকে ভাল করে পরিশোধন করা দরকার।

(খ) গোটা আবর্জনাসমূহকে উৎসেই জৈব-বিয়োজনীয় (biodegradable) এবং জৈব-অবিয়োজনীয় (non biodegradable) হিসাবে ভাগ করে ফলপ্রসু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেগুলোর বিয়োজন ঘটাতে হবে।

(গ) রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের প্রয়োগে উৎসাহ জোগানো উচিত।

(ঘ) রাসায়নিক কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

(ঙ) মাটিতে থাকা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহ দূর করার জন্য জৈব পরিচর্যা (bioremediation) পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

(চ) ভূমি প্রদূষণকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রবর্তন।

(ছ) মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত।

শব্দ প্রদূষণ ঃ

প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন ধরণের শব্দ শুনি। কোলাহলপূর্ণ শহর, বিভিন্ন ধরণের পরিবহণ ব্যবস্থা, আমোদ-প্রমোদের বিভিন্ন নতুন কৌশল ইত্যাদি আমাদের পরিবেশে বিভিন্ন ধরণের শব্দ সৃষ্টি করে এবং এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মানুষের আলোচনা করা উচিত। একটি নির্দিষ্ট শব্দ কারোর জন্য মধুর হতে পারে কিন্তু অন্যদের কাছে তা হতে পারে কোলাহল মাত্র। যখন একটি শব্দ কোমল হয় তখন তা হয় মধুর এবং উচ্চস্বরে হলে কোলাহল। তাই বিশেষ করে শহর অঞ্চলে শব্দ প্রদূষণ হয়ে উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের কারণ।

শব্দ প্রদূষণের উৎস ঃ

(ক) প্রাকৃতিক

(খ) মানব সৃষ্ট

(ক) প্রাকৃতিক ঃ মেঘের গর্জন হচ্ছে প্রদূষণের প্রাকৃতিক উৎস।

(খ) মানব-সৃষ্ট ঃ মানুষের বিভিন্ন ধরণের কার্যকলাপ মূলত শব্দ প্রদূষণের সৃষ্টি করে। ট্রাক, বাস, স্কুটার, অগ্নি নির্বাপক গাড়ি, পুলিশ ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি বাহন, বিভিন্ন ধরণের বিমান, রেলগাড়ি, উদ্যোগ, কল-কারখানা লাউড স্পিকার, বাদ্যযন্ত্র, সাইরেন, বিস্ফোরণ ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট অবাঞ্ছিত শব্দ প্রদূষণ সৃষ্টি করে। দীপাবলি উৎসবের আতসবাজির শব্দ অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন উৎসবে শব্দ প্রদূষণ ঘটতে দেখা যায়।

শব্দ প্রদূষণের প্রভাব ঃ

শব্দ প্রদূষণের প্রভাব শ্রবণ-প্রভাব এবং অশ্রবণ- প্রভাব ধরণের হতে পারে

(ক) শ্রবণ-প্রভাব (Auditory effects) ঃ শব্দ প্রদূষণের সবচেয়ে ক্ষতিকারক এবং তাৎক্ষণিক প্রভাব হচ্ছে শ্রবণ শক্তির হ্রাস। শব্দ প্রদূষণ শ্রবণ শক্তি ক্রমশ হ্রাস করে আনে এবং এরফলে মানুষ বধির হয়ে পরে।

(খ) অশ্রবণ-প্রভাব (Non-auditory effects) ঃ অশ্রবণ প্রভাবসমূহ একইভাবে ক্ষতিকারক। বার্তালাপে অসুবিধা, বিরক্তিভাব, মানসিক উদ্বেগ, মানসিক চাপ, উগ্র আচরণ ইত্যাদি শব্দ প্রদূষণের অশ্রবণ প্রভাব। এই প্রদূষণের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব পরে। শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং কর্মদক্ষতা কমে। অতি মাত্রায় শব্দ প্রদূষণের জন্য মানসিক অসংগতিও দেখা দেয়।

গোটা আবর্জনা থেকে সৃষ্ট প্রদূষণ ঃ ঘরোয়া, ব্যবসায়িক, প্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, খনন এবং ঔদ্যোগিক কাজ-কর্মের ফলে গোটা আবর্জনার সৃষ্টি হয়। এগুলোকে ব্যবহারের অনুপযোগী বলে ফেলে দেওয়া হয়। গোটা আবর্জনার একটি সংজ্ঞা হচ্ছে —ভুল স্থানে ফেলে দেওয়া সামগ্রী। দ্রুত নগরায়ণ, ঔদ্যোগীকরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গোটা আবর্জনা গুরুতর হুমকির সৃষ্টি করেছে। শীঘ্রেই

পরিবেশের উপরে কঠিন আবর্জনার প্রভাব

এর বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হ'লে আগামী বছরগুলোতে এই সমস্যার আরও অবনতি ঘটবে। জলে এই ধরণের আবর্জনা নিক্ষেপ করার কুফল দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয়। একদিকে তা বায়ু, জল এবং মাটি দূষিত করে যার ফলে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয় এবং মানুষের বাসস্থানের পরিবেশ নষ্ট করে। অন্যদিকে গোটা আবর্জনা জলে ফেলে দিলে আমাদের বিদ্যুৎ, সার, শক্তি উৎপাদনের উৎসগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অব্যবহার্য বস্তুকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারলে এর ফল দ্বিগুণ করা যায়।

নাগরিক এবং গ্রাম্য উভয় অঞ্চলেই গোটা আবর্জনার সমস্যা থাকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী এই সমস্যার শীঘ্র সমাধান সম্ভব না হলে অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। পুর আবর্জনাসমূহ দৈনিক পরিষ্কার করা এবং পরিবহণ ইত্যাদির সঙ্গে আবর্জনার ব্যবস্থায়ন (Processing) এবং পরিত্যাগ (disposal)-এর জন্য প্রতিদিন কাজের সমন্বয় রক্ষা করা দরকার। এই কাজকর্মে অর্থের যোগান, প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম, কর্মচারী, প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক, নীতি-নির্দেশ, জনসম্পর্ক রক্ষা, গণ সচেতনতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালনা জরুরি। এককথায় বলতে গেলে গোটা আবর্জনা পরিচালনা অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত প্রয়োজনসাপেক্ষে নিজের মধ্যে—

(ক) গোটা আবর্জনার ফলপ্রসূ বর্জন

(খ) গোটা আবর্জনা পুনর ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তি গ্রহণ করা— এই দুটি কাজ করে।

গোটা আবর্জনার পরিবেশগত প্রভাব ঃ

গোটা আবর্জনা বাতাস, জল এবং মাটিতে মিশে পচে গলে যায়। কিন্তু এই আবর্জনা যত্রতত্র ফেললে তা স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ক্ষতি করে। যারা এই আবর্জনার সঙ্গে বা আশেপাশে কাজ করে তাদের জন্য বিপদের সম্ভাবনা বেশি এবং এই ক্ষতিকর আবর্জনা যাতে শরীরের সংস্পর্শে না আসে

তার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিতে হয়। চিকিৎসালয় বা ক্লিনিক থেকে নির্গত জল নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া উচিত।

আবর্জনার জন্য মানুষের শরীরের ক্ষতি হয় পরোক্ষভাবে এবং প্রধানত মাছি এবং ইঁদুরের মাধ্যমে রোগ মহামারী রূপে ছড়ায়। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা এবং জমা করে রাখার জন্যই প্লেগ, ডেংগু, কলেরা ইত্যাদি বিপদসমূহ ছড়িয়ে পরে। আবর্জনা জ্বালালেও যথেষ্ট বায়ু প্রদূষণ হয়। স্নান করা, জলসেচ এবং খাওয়ার সময় প্রদূষিত জল ব্যবহার করলে এর মাধ্যমে চামড়ার রোগ সহ বিভিন্ন ধরণের রোগ হয়।

গোটা আবর্জনার ফলে অন্য একটি ক্ষতির দিক হচ্ছে নৈসর্গিক। রাস্তাঘাটে পরে থাকা কাগজপত্র, প্যাকেট ইত্যাদি নানা আবর্জনা এবং শহরের বাইরে জমা করে রাখা আবর্জনা নান্দনিক সৌন্দর্য নষ্ট করে। গুরুত্বপূর্ণ এবং অবহেলিত সমস্যাটি হচ্ছে জলে প্রদূষণের স্থানান্তর। উল্লেখ্য যে, আবর্জনা জমা করে রাখলে সেগুলো থেকে নির্গত অপরিচ্ছন্ন জল পরিষ্কার জলের সঙ্গে মেশে এবং ভূগর্ভে প্রবেশ করে। সঠিকভাবে ভাগ না করে আবর্জনা জ্বালিয়ে দেওয়ায় প্রদূষণের সৃষ্টি হয়। ঔদ্যোগীকরণের ফলেই মূলত ক্ষতিকারক আবর্জনার সৃষ্টি হয়। তাই সঠিকভাবে আবর্জনাসমূহ নষ্ট করার ব্যবস্থা না করলে এর ফলে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বর্তমানে নগরাঞ্চলে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে গোটা আবর্জনাসমূহ নষ্ট করা হয় যা বিভিন্ন ধরণের পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করে, যেমন—

■ আবর্জনা ফেলার স্থান দূষিত হয়ে পরে এবং সেখানে রোগ জীবাণুর বাহক ইঁদুর, মাছি ইত্যাদির বংশবৃদ্ধি করে।

■ অণুজীবের মাধ্যমে গোটা আবর্জনার পচনের ফলে চারপাশের এলাকায় মিথেন গ্যাস নির্গত হয়।

■ গোটা আবর্জনা থেকে নির্গত বা তার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া জল মাটি, খোলা জলের উৎস এবং ভূগর্ভের জলে মিশ্রিত হয়।

■ গোটা আবর্জনায় বিভিন্ন ধরণের সামগ্রী মিশ্রিত থাকে এবং এগুলোকে কোনো পর্যায়ে পৃথক করা হয় না। এই আবর্জনার মধ্যে উদ্যোগ, চিকিৎসালয়, নার্সিং হোম, ঘরোয়া কামকাজ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরণের বর্জ্য পদার্থ থাকে।

■ আবর্জনার স্তূপ থেকে বয়ে আসা অপরিচ্ছন্ন জলে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত হয়ে থাকে এবং এই জল ভূগর্ভের জলকে প্রদূষিত করে।

■ আবর্জনা ফেলার স্থানে মাটির উপরিভাগ পাকা না হওয়ার ফলে বা অন্য কোনো আবরণ না থাকার ফলে অপরিচ্ছন্ন জল মাটির তলায় প্রবেশ করে প্রদূষণ সৃষ্টি করে।

■ আবর্জনা জমা করা স্থানের পাশে বসবাস করা মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়াটা অবধারিত।

■ ঘরে ঘরে গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে আনাটা সময়ের অপচয় এবং এর জন্য আবর্জনা সংগ্রহের খরচ বাড়ে।

■ ট্রেক্টর না ট্রাকে প্রকাশ্যভাবে আবর্জনা বহন করা অস্বাস্থ্যকর এবং তা শহরের সৌন্দর্যও নষ্ট করে।

প্রশ্নাবলি

১। পরিবেশ প্রদূষণ বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন প্রকারের প্রদূষণের বিষয়ে লেখ।
২। বায়ু প্রদূষণ কী? বায়ু প্রদূষণের উৎসসমূহ চিহ্নিত কর।
৩। মানব শরীরে বায়ু প্রদূষণের প্রভাবের বিষয়ে উল্লেখ কর।
৪। জলপ্রদূষণ কী? মানব শরীরে জল প্রদূষণের প্রভাবসমূহ কী কী?
৫। ভূমি প্রদূষণ কী? তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
৬। গোটা আবর্জনা কী? সেগুলোকে কীভাবে ভাগ করা হয়? উদাহরণ দাও।
৭। গোটা আবর্জনার পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। গোটা আবর্জনা পরিচালনার দুটি পদ্ধতি উল্লেখ কর।
৯। শব্দপ্রদূষণ কী? মানব শরীরে এর দুটি প্রভাব উল্লেখ কর।
১০। পানীয় জলের উৎস পরিস্কার এবং নিরাপদ রাখতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

ষষ্ঠ অধ্যায়
সামাজিক বিষয় এবং পরিবেশ

বহনক্ষম উন্নয়নের ধারণা ঃ

বুর্জোয়া সমাজ, নগরায়ন এবং দ্রুত হারে হওয়া শিল্পায়ন সাম্প্রতিককালে ভূমি, জল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করার ফলে পরিবেশের মানের অবক্ষয় ঘটেছে। পরিবেশের মানের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশ শতকের শেষ ভাগে বহনক্ষম উন্নয়ন (Sustainable development) নামের একটি নতুন ধারণা এল যাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি পরিবেশ সংরক্ষণকারী, পরিবেশবিদ, প্রকল্পবিদ এবং নীতিনির্ধারকরা একমুখে বহনক্ষম উন্নয়ন ধারণাটির মাধ্যমে প্রকৃতির ভারসাম্য বা পরিবেশের মান রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করছেন।

১৯৮৭ সালে 'পরিবেশ এবং উন্নয়নের বিশ্ব সংস্থা' (WCED, 1987)-এর উদ্যোগে 'বার্টল্যান্ড রিপোর্ট', 'আওয়ার কমন ফিউচার' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে বহনক্ষম উন্নয়নের ধারণাটা যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। বার্টল্যান্ডের মতে বহনক্ষম উন্নয়ন হচ্ছে এমন উন্নয়ন যা 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাদের নিজেদের প্রয়োজনগুলো আহরণের ক্ষমতার সঙ্গে কোনো আপোস না করে বর্তমান প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে।' জি এইচ বার্টল্যান্ড নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন। পরিবেশ এবং উন্নয়নের বিশ্ব সংস্থার (ECED) মতে বহনক্ষম উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তনের এমন একটা প্রক্রিয়া যা সম্পদ আহরণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দিক নির্ণয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে প্রয়োজন এবং সুরক্ষিত ভবিষ্যতের মধ্যে একটি ঐক্য রক্ষা করে।

তা একদিকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে। এবং অন্যদিকে পরিবেশ রক্ষা করে সবার জীবনের মানের উন্নয়নই এর উদ্দেশ্য।

১৯৯২ সালের জুন মাসে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে 'ধরিত্রী সম্মেলন' (Earth Summit) হিসাবে খ্যাত রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ এবং উন্নয়নের সম্মেলন (UNCED) অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বহনক্ষম উন্নয়ন ধারণাটি অধিক অগ্রগতি এবং ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করেছে। এই সম্মেলনে বহনক্ষম উন্নয়নের ২৭ টি নীতি তালিকাভূক্ত করা সহ 'রিও ঘোষণা পত্র' স্বাক্ষরিত হয়। এই ঘোষণা পত্রের 'কর্মসূচী ২১'-এ একুশ শতাব্দীর বহনক্ষম উন্নয়নের কর্ম-পরিকল্পনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং জীব বৈচিত্র্যের নীতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শক্তির প্রয়োগ এবং সংরক্ষণ ঃ

কাজ করার ক্ষমতাই হচ্ছে শক্তি। শক্তিকে ধ্বংস করা যায় না, তাকে একটি রূপ থেকে অন্য রূপে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কোনো একটি দেশ কতটা শক্তি খরচ করে তা সে দেশের উন্নয়নের সূচক হিসাবে সাধারণত পরিগণিত হয়। একটি দেশে জনপ্রতি কতটা শক্তি ব্যবহার হয় তার ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। কারণ সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ-কর্ম প্রত্যক্ষভাবে শক্তির সঙ্গে জড়িত। আমাদের কল-কারখানা, যাতায়াত ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, শীতলীকরণ, গরম করা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বৃহৎ পরিমাণের শক্তির আবশ্যক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীব শৈলীর দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদাও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমদের প্রথমে শক্তির বিভিন্ন উৎস এবং কোথা থেকে এই চাহিদা পূরণ করা যায় তার ওপর আলোকপাত করতে হবে।

শক্তির উৎস ঃ

যে উৎস দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারা যথেষ্ট পরিমাণের শক্তির যোগান ধরতে পারে সেটাই শক্তির উৎস। এই উৎসসমূহেকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(ক) নবীকরণযোগ্য বা অপ্রচলিত শক্তির উৎস (Renewable or nonconventional energy resources)

(খ) নবীকরণ-অযোগ্য বা প্রচলিত শক্তির উৎস (Non-renewable or conventional energy resources)

(ক) নবীকরণ-যোগ্য শক্তির উৎস ঃ

এই শক্তির উৎসসমূহ প্রকৃতপক্ষে ক্রমাগত সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই শক্তি অফুরন্ত। যেমন- সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তি, ভূ-তাপবিদ্যুৎ শক্তি, সাগরীয় তাপ শক্তি, জোয়ার শক্তি, কাঠ, জৈব পচন শক্তি, জৈব ইন্ধন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি। এই ধরণের শক্তিকে বারবার ব্যবহার করা যায়। এইসমূহ অপ্রচলিত এবং শক্তির বিকল্প উৎস।

(খ) নবীকরণ-অযোগ্য শক্তির উৎস ঃ

এই শক্তির উৎসসমূহ প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এইসমূহ শক্তির উৎস অফুরন্ত নয়। যদি একবার এই শক্তির ভাণ্ডার শেষ হয় তাহলে সহজে সেইসমূহকে পূরণ করা সম্ভব হয় না। জীবাশ্ম ইন্ধন (কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস), পারমাণবিক ইন্ধন যেমন ইউরোনিয়াম, থরিয়াম ইত্যাদি হচ্ছে নবীকরণ-অযোগ্য শক্তির উৎস। মানব সমাজের শক্তির চাহিদা পূরণ করার জন্য এইসমূহ প্রচলিত শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

শক্তির সংরক্ষণ ঃ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন অধিকভাবে শক্তির ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক কালে শক্তি ব্যয়ের হারকে সভ্যতার বেরোমিটার বলে বিবেচনা করা হয়। একটি রাষ্ট্রের শক্তির সম্ভাবনা যতটুকু তা সেইদেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং উন্নতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু শক্তির সংকটের ফলে শক্তি-নীতি প্রস্তুত করতে হয়েছে। এর মাধ্যমে শক্তি খরচের মাত্রা বৃদ্ধি এবং তার ধরন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এর জন্যে শক্তির সংরক্ষণের কৌশলও গ্রহণ করা উচিত।

শক্তি সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে শক্তির খরচ হ্রাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শক্তির বর্ধিত দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার হ্রাস পাওয়া শক্তির ব্যবহার একত্র

করা এবং প্রচলিত শক্তির উৎস থেকে শক্তির ব্যবহার হ্রাস করে শক্তির সংরক্ষণ করা যায়। আর্থিক মূলধন বৃদ্ধি পরিবেশের গুণমান, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং মানুষের সুখ-শান্তির মাধ্যমে শক্তির সংরক্ষণের সাফল্য প্রকাশ পায়। শক্তির খরচ কমাতে এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য শক্তির সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং সংস্থাসমূহ শক্তির প্রত্যক্ষ গ্রাহক। লাভ বৃদ্ধির জন্য ঔদ্যোগিক এবং বাণিজ্যিক উপভোক্তারা শক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। যেসমূহ শক্তি অর্থ-কমানোর সঙ্গে পরিবেশ রক্ষা করে তেমন শক্তি যোগান ধরা পরিবেশ অনুকূল জীবন-শৈলী শক্তি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সহায়ক। যখন আমরা শক্তির পরিমাণ হ্রাস করি তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করি। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে নিম্নোল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহকে শক্তি সংরক্ষণের জন্য অবলম্বন করা যায়—

(ক) পেট্রোলিয়াম, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি জীবাশ্ম ইন্ধন এবং নবীকরণ-অযোগ্য শক্তি সম্পদের পরিবর্তে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জৈবগ্যাস ইত্যাদি পুনর নবীকরণ-যোগ্য শক্তি সম্পদের ব্যবহার।

(খ) যথেষ্টভাবে শক্তি সংরক্ষণ করার মতো অধিক দক্ষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

(গ) বিদ্যুতের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের নিষিদ্ধ করা উচিত।

(ঘ) ঘরে ব্যবহার করা বিভিন্ন কাজকর্মে উপভোক্তা শক্তির খরচ কমাতে পারে।

(ঙ) উদ্যোগসমূহ কাঁচামালের সঠিক ব্যবহারের জন্য কারিগরী কৌশল উদ্ভাবন করা উচিত।

বৃষ্টির জল কর্ষণ ঃ

বৃষ্টির জল কর্ষণ হচ্ছে পাকা বা টিন ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত ঘরের চাল এবং পাকা ছাদ থেকে পরা বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কৌশল। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং জমা করার ব্যবস্থা ভূগর্ভের জলও বৃদ্ধি করে। কুয়ো, গর্ত, বাঁধ ইত্যাদি বৃদ্ধির জল ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা বিশেষ আধারসমূহের নির্মাণের মাধ্যমে ভূগর্ভের জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আজকাল খরার দিনে জলের অভাব দূর করতে শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও ঘরোয়া কাজকর্মে

ব্যবহার করা জলের অভাব পূরণ করতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৃষ্টির জল কর্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে—

- বয়ে গিয়ে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো
- জলের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করা
- ভূগর্ভস্থ জলের ওপর চাপ কমানো
- জল একসঙ্গে করে রাখার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলের মান বৃদ্ধি করা।

যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত এলাকায় প্রচলিত সরকারি জল সরবরাহ প্রকল্প এবং উন্নত মানের জল নেই সেই স্থানগুলোর জন্য বৃষ্টির জল কর্ষণ আবশ্যকীয়। উত্তরপূর্বাঞ্চল আমাদের দেশের এমন একটি এলাকা যেখানে বর্ষাকালে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু শীতকালে অতি কম বৃষ্টি হয়। তাই এই অঞ্চলে বৃষ্টির জল বর্ধিত চাহিদা পূরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ, পরিবেশবিদ, সাংবাদিক এবং সাধারণ মানুষ বৃষ্টির জল সংরক্ষণের প্রতি ব্যাপকভাবে আগ্রহী হয়েছেন। বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, মুম্বাই, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট ইত্যাদি শহরসমূহে ব্যাপকভাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মিজোরাম, মেঘালয়ের কিছু এলাকা, অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুরে এই ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গুয়াহাটির কিছু পাহাড়ি এলাকায় মানুষ বৃষ্টির জল সংরক্ষণ শুরু করেছেন।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণের সুবিধা ঃ

- এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আবশ্যক স্থানে জলের একটি উৎস গড়ে তোলা যায়।
- এই ব্যবস্থাটি কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্রতিটি পরিবার সহজেই বৃষ্টির জল পুনর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- ফ্লোরাইড, আর্সেনিক, লোহা (Iron) ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ বৃষ্টির জলে থাকে না।

- যেহেতু বিশ্বের বহু শহরে এখন ভূমিজলের সমস্যা গুরুতর তাই ঘরোয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃষ্টির জলের ব্যবহার ভূমিজলের ওপর চাপ হ্রাস করে।
- জরুরীকালীন সময় এবং সরকারি জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পরার সময় তা অতি প্রয়োজনীয় ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে।
- বৃষ্টির জল সংগ্রহ ব্যবস্থাটি সহজ হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ কম খরচে বৃষ্টির জল জমা করতে পারে, একটি ভাণ্ডার তৈরির মতো করিগরী কৌশল সহজে রপ্ত করতে পারে।

পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)র মতে স্বাস্থ্য হচ্ছে মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণের একটি পূর্ণ ব্যবস্থা। শুধু রোগমুক্ত এবং সুস্থ অবস্থাটিকেই স্বাস্থ্য বলা যায় না। আশ পাশের পরিবেশ থেকেই মানুষের স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয়। পরিপুষ্টি, রাসায়নিক, ভৌতিক, জৈববৈজ্ঞানিক, মানসিক, শোচনীয় জীবন ধারণ ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। পানীয় জলের যোগান স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য, মানুষের মৌলিক অধিকার এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ফলদায়ক প্রকল্পের একটি উপাদান জল। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় নীতি নির্ধারণের বিভিন্ন মঞ্চে দীর্ঘদিন ধরে জল অনাময় (Sanitation) এবং পরিচ্ছন্নতা (hygiene)র গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

টাইফয়েড, কলেরা, হেপাটাইটিস, পলিও, গ্যাস্ট্রোএণ্ট্রাইটিস, অ্যামিবায়োসিস, জিয়ারাডিয়াসিস ইত্যাদিসহ ভারতের ৮০ শতাংশেরও বেশি রোগ হচ্ছে জলবাহিত রোগ। জল থেকে সবচেয়ে বেশি দেখা দেওয়া রোগ হচ্ছে অণুজীবের সংক্রমণ। বহু বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশক দ্রব্য, কঠিন মৌল (পারদ, কেডমিয়াম, সিসা ইত্যাদি) বিভিন্ন ভাবে জল এবং মাটিতে মিশে থাকে। এই দ্রব্যসমূহ খাদ্য শৃংখলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং শরীরে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

আবার বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থাও বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের উৎপত্তি ঘটায়। তারমধ্যে কিছু গ্যাস (যেমন-সালফার ডাইঅক্সাইড,

কার্বমনোক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রকার্বন এবং বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলিকণা) বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। গোটা আবর্জনা বায়ু, জল এবং মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে। তা থেকে স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের প্রতি হুমকির সৃষ্টি করে। কখনও বা শোচনীয় অপরিষ্কার অবস্থায় থাকা বাড়িঘরও স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি করে। সাধারণত শহরাঞ্চলের বস্তিবাসীদের মধ্যে এমন অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। নিরক্ষরতা, নিজের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, দারিদ্র্য, পরিবারের বিশাল আকার, শোচনীয় নালা-নর্দমা, অনাময় ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থার কারণ।

সবুজ গৃহ প্রভাব ঃ

জীবের বেঁচে থাকার সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ হচ্ছে পৃথিবী। জল, অক্সিজেনসমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল, মাটি এবং একটি উপযুক্ত উষ্ণতার মতো অনন্য পরিবেশগত অবস্থার উপস্থিতির জন্য পৃথিবীতে জীবের বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। সূর্য থেকে আসা শক্তির ৩০ শতাংশ ফের মহাকাশে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় যদিও বাকি অংশ (৭০ শতাংশ) পৃথিবীতে প্রবেশ করে। এই শক্তি বায়ু জল, মাটি গরম করে রাখে। দিনের বেলা সূর্য থেকে আসা শক্তি (বেশিরভাগ দৃশ্যমান রশ্মির অংশ) ভূ-পৃষ্ঠ শোষণ করে নেয়। যদি সূর্য থেকে আসা সমস্ত শক্তি পৃথিবী শোষণ করে নেয় তাহলে পৃথিবী ধীরে ধীরে অধিক উষ্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু পৃথিবী যদিও শক্তি শোষণ করে তার কিছু অংশ অবলোহিত রশ্মি (দীর্ঘ তরংগদৈর্ঘ্য, কম শক্তি বিশিষ্ট) হিসাবে নির্গত করে। তার সমস্ত টুকু মহাকাশে চলে যায় না। তার কিছু অংশ বায়ুমণ্ডলে অতি কম পরিমাণে থাকা কিছু গ্যাস যাকে সবুজ গৃহ গ্যাস (জি এইচ জি) বলা হয়, সেই গ্যাসসমূহ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লরোফ্লুরোকার্বন (সি এফ সি), জলীয় বাষ্প এবং অ'জোন। এই গ্যাসসমূহ কিছু পরিমাণের তাপ ফের ভূ-পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করে। যেহেতু এই প্রক্রিয়াটি উদ্যান শস্যের জন্য

কাঁচের নির্মিত গ্রিণ হাউসের ভেতরের উষ্ণতার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা প্রক্রিয়াটির সঙ্গে একই, তাই তাকে সবুজ গৃহ প্রভাব (গ্রিণ হাউস এফেক্ট) বলা হয়।

গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি ঃ

সবুজ গৃহ প্রভাবের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা প্রায় ১৫° সেন্টিগ্রেড। আর এই উষ্ণতা পৃথিবীর বিভিন্ন ধরণের জীবের জন্য অনুকূল। কিন্তু যদি সবুজ গৃহ গ্যাসসমূহ এই কাজ না করে তাহলে পৃথিবীর অধিক পরিমাণের তাপ সরে যাবে। এর ফলে পৃথিবী শীতল হয়ে যাবে (প্রায়- ১৮° সেন্টিগ্রেড) এবং এতে পরিবেশ জীবকুল বেঁচে থাকার জন্য অযোগ্য হয়ে পড়বে। বায়ুমণ্ডলে থাকা সবুজ গৃহ গ্যাসসমূহ আমাদের গ্রহটিকে উষ্ণ করে রাখার ফলে এখানে আমরা এবং অন্যান্য জীবসমূহ বেঁচে থাকে পারি। কিন্তু মানুষের কার্য- কলাপের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে গত কয়েক দশকে সবুজ গৃহ গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন যে গত শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ০.৩-০.৬.২ সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৫০ বছর আগে শুরু হওয়া শিল্প বিপ্লব থেকে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ বায়ুমণ্ডলে সবুজ গৃহ গ্যাসের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। ১৭৫০ এবং ২০০০ সালের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইডের বায়ুমণ্ডলীয় গাঢ়তা যাথক্রমে ৩১ শতাংশ, ১৭১ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (আইপিসিসি, ২০০১)। সবুজ গৃহ গ্যাসসমূহ একটি আবরণ সৃষ্টি করে উষ্ণতা বৃদ্ধি করার এই ঘটনাকেই বলা হয়েছে গোলকীয় উষ্ণায়ন বা উষ্ণতা বৃদ্ধি (গ্লোবাল ওয়ার্মিং)।

জলবায়ুর পরিবর্তন ঃ

জলবায়ু হচ্ছে একটি অঞ্চলের আবহাওয়ার গড়স্বরূপ বা প্রকৃতি। আবহাওয়া হচ্ছে সেই স্থানটির উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বাতাস, আলোর প্রাবল্য, কুয়াশা ইত্যাদির দৈনন্দিন বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা। দীর্ঘদিনের অর্থাৎ কমপক্ষে ৩০-৪০ বছরের এই আবহাওয়ার গড় অবস্থাই হচ্ছে জলবায়ু।

জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ুর অবস্থার পরিসংখ্যানগত ভিন্নতা বা এক দীর্ঘ সময়ের জন্য দেখা দেওয়া অবস্থার ভিন্নতা। অন্য ভাষায় বলতে

গেলে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে উষ্ণতার বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন, খরা পরিস্থিতির বৃদ্ধি, তীব্র শীত ইত্যাদি জলবায়ুতে দেখা দেওয়া অবাঞ্ছিত পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তন একটি জটিল বিষয়। তথ্য মাপজোখের ব্যবস্থাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে এবং জলবায়ুর প্রক্রিয়াসমূহকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোঝার ক্ষেত্রে একটি বড়ো অনিশ্চিয়তা রয়েছে। তৎসত্ত্বেও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

ওজোন স্তরের ক্ষয় ঃ

ওজোন এক ধরণের সাদা-নীল বর্ণের গ্যাস। বেশি থাকে স্ট্রেটোস্ফিয়ারে। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৫০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত ওজোন স্তর ব্যাপ্ত থাকে। সূর্যের রশ্মিতে থাকা অতিবেগুনি (UV) বিকিরণের একটা বড়ো অংশ ওজান গ্যাস শোষণ করে নেয় এবং তার দ্বারা সূর্যের রশ্মিতে থাকা অতিবেগুনি বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পৃথিবীর জীবকুলকে রক্ষা করে। অবশ্য অতিবেগুনি রশ্মির একটি ক্ষুদ্র অংশ এসে পৃথিবীর নিম্নস্তরে পৌঁছায়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৫-৩০ কিলোমিটার উচ্চতার স্ট্রেটোস্ফিয়ারে ওজোন গাঢ়তা সর্বাধিক প্রায় ১০ পি পি এম হয়।

সম্প্রতি ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া নিয়ে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা চলছে এবং এই সমস্যাটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ওজোন ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কিত সমস্যা এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব পৃথিবীর জীবকূলের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ। মারাত্মক এবং ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মিকে পরতে না দিয়ে জীবমণ্ডলীয় পরিস্তিতিতন্ত্র (ইকোসিস্টেম)এর ওপর এক আবরণের মতো কাজ করার জন্য ওজোনের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই স্তর না থাকলে সূর্যের সমস্ত অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীর ওপরপৃষ্ঠে পরবে এবং এর ফলে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের উষ্ণতা এমন বৃদ্ধি পাবে যে এই উষ্ণতায় কোনো জীবই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবে না।

আশির দশকের প্রথমভাগে বিজ্ঞানীরা এণ্টার্কটিকায় ওজোন স্তরে একটি বড় ফুটো দেখা গেছে বলে জানান। এণ্টার্কটিকায় ওজোন গ্যাস ত্রিশ শতাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। একই সময়ে একই ধরণের ফটো আবিষ্কৃত হয় ঘন

জনবসতিপূর্ণ উত্তর গোলার্ধেও। এই বিষয়টি উত্তর ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি করে। ফের 'নাসা'র বিজ্ঞানীদের চালানো এক সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে ১৯৬৯ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে উত্তর গোলার্ধের ওজোনের পরিমাণ ত্রিশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। প্রতি শতাংশ ওজোন হ্রাস পাওয়ার জন্য অতিবেগুনি রশ্মি শরীরে পরার ফলে মানুষের কর্কট রোগের পরিমাণ ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের স্ট্রেটোস্ফিয়ারে মানব সৃষ্ট প্রদূষণের গাঢ়তা বৃদ্ধি। তার মধ্যে একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে ১৯৩০ সালে আবিষ্কৃত ক্লরোফ্লুরো কার্বন (সিএফসি)। এই পদার্থগুলো বিষাক্ত নয়, সুস্থির, নিষ্ক্রিয়, সস্তা, কার্যকর, এবং ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক হওয়ায় বিভিন্ন কাজ তথা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এরোসল প্রপেলেণ্টস, পরিষ্কার করা দ্রব্য, রিফ্রিজারেন্ট (শীতলীকরণে ব্যবহৃত দ্রব্য), প্লাস্টিক ফোম, ফাস্ট ফুড প্যাকেজিং, কাপড় ধোয়া, অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত সামগ্রী বীজাণুমুক্ত করা, ঔষধ তৈরি, ইলেক্ট্রোনিক সামগ্রী পরিষ্কার করা, রং এবং বার্নিশ উদ্যোগ ইত্যাদি কাজে ব্যাপকহারে সি এফ সি ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে এই গ্যাসসমূহ বায়ুমণ্ডলে ৫০ বছরের বেশি সময় থাকতে পারে। সি এফ সি গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ধীরে ধীরে মুক্ত হয় এবং যেহেতু এই গ্যাসসমূহের জন্য কোনো আধার পাত্র (সিংক) নেই, তাই সিএফসি দীর্ঘদিন ধরে স্বাভাবিক থাকতে পারে। প্রায় ত্রিশ বছরের শেষে স্ট্রেটোস্ফিয়ারে সিএফসির বিয়োজন ঘটে এবং মুক্ত ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াটি থেকে ক্লোরিন গ্যাস না সরানো পর্যন্ত ক্লোরিন অণুসমূহ ওজোন ধ্বংসকার্যে লিপ্ত থাকে। অনুঘটকের মত আচরণ করে প্রতিটি সিএফসি অণু প্রায় ১০০,০০০ ওজোন অণু ধ্বংস করে।

গ্রহণসাপেক্ষ প্রতিরোধী ব্যবস্থা ঃ

এখন এই প্রশ্ন উত্থাপনের সময় এসেছে— সিএফসির পরম্পরাগত বহুল প্রয়োগসমূহ সত্যিই প্রয়োজনীয় কি? সিএফসির বিকল্প খোঁজার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলানো উচিত। এর একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প হচ্ছে

হাইড্রোক্লরোফ্লুরো কার্বন (HCFC) এবং এর ওজোনকে ক্ষতি করার ক্ষমতা সিএফসির দশভাগের একভাগ মাত্র। রিফ্রিজারেটরের শীতলীকরণ দ্রব্য হিসাবে সিএফসির পরিবর্তে হিলিয়াম ব্যবহার করা যায়।

সিএফসির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৮৭ সালে মাণ্ট্রিলে অনুষ্ঠিত এক সম্মিলনে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (মণ্ট্রিল প্রটোকল) ৩৪টি দেশ স্বাক্ষর করে এবং ২০০০ সালের সিএফসির ব্যবহার ৫০ শতাংশ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিশ্বে বছরে $১০^৯$ কিলোগ্রামের বেশি সিএফসি উৎপন্ন করা হয়। তারমধ্যে ৬৯ শতাংশ ব্যবহার করে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা, অপরদিকে চিন ও ভারত ব্যবহার করে মাত্র পাঁচ শতাংশ।

আজ বিশ্ব সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে ওজোন স্তর ধ্বংসকারী সিএফসি গ্যাসের উৎপাদন এবং ব্যবহার যথেষ্ট কমিয়ে আনা। বিজ্ঞানীদের এই গ্যাসের বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে। বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ভয়াবহ প্রভাবসমূহের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দিনটি আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর সুরক্ষাদিবস হিসাবে পালন করা হয়। ওজোন স্তরের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে শতাধিক দেশে ১৯৮৭ সালের এই ১৬ সেপ্টেম্বর দিনটিতে মণ্ট্রিল প্রটোকলে স্বাক্ষর করেছিল।

অ্যাসিড বর্ষণ ঃ

ঔদ্যোগিক কাজকর্ম এবং জীবাশ্ম ইন্ধনের ফলে উৎপন্ন সালফার এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসসমূহ থেকে সৃষ্ট অ্যাসিডের প্রধান উৎস। বিভিন্ন দিকে বইতে থাকা জলীয় বাষ্পসমৃদ্ধ বাতাস যখন সালফার ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহকে স্পর্শ করে তখন সেই জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফেট এবং নাইট্রেটের ক্ষুদ্র কণা সৃষ্টি করে। এই রাসায়নিক পদার্থসমূহ তরল (যেমন অ্যাসিড বর্ষণ, তুষার, কুয়াশা এবং মেঘবাষ্প ইত্যাদি) এবং শুকনো (যেমন অ্যাসিড ধূলিকণা) পদার্থরূপে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে সৃষ্ট মিশ্রণটিকে অম্ল বর্ষণ বা অ্যাসিড বর্ষণ বলা হয়।

প্রশ্নাবলি

১। বহনক্ষম উন্নয়ন বলতে কী বোঝ?
২। নবীকরণযোগ্য এবং নবীকরণ-অযোগ্য শক্তির উৎস সমূহ কী কী? উদাহরণ দাও।
৩। শক্তি সংরক্ষণ কী? শক্তি সংরক্ষণের জন্য গৃহীত কিছু ব্যবস্থার উল্লেখ কর।
৪। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ কী? বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উদ্দেশ্য কী?
৫। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ কী?
৬। পরিবেশের মাধ্যমে স্বাস্থ্য কীভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারে?
৭। দুর্যোগসমূহ কী?
৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝ? বন্যার সময় কী ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ করা যায়?
৯। "জন বিস্ফোরণ হ'ল পরিবেশ অবক্ষয়ের মূল কারণ।" —এই কথাটির ব্যাখ্যা কর।
১০। 'সবুজ গৃহ প্রভাব' কী? প্রধান সবুজ গৃহ গ্যাসগুলি কী কী?

দ্বিতীয় ভাগ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ দায়িত্ব ও সাবধানতা

প্রকৃতির সঙ্গে মানব সমাজের একটি অতি নিবিড় সম্পর্ক আছে, এই কথাটি সর্বজন বিদিত। কিন্তু এই সম্পর্ক সবসময়ই মধুর নয়। মানুষ এবং প্রকৃতির এই যুগ্ম সম্পর্ক সময়বিশেষে বিভিন্ন আঘাতের সন্মুখীন হয়। এর প্রধান কারণ দুটি। প্রথম কারণটি হ'ল নান্দনিক প্রকৃতিকে অপরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করে মানুষের নিজস্ব সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার অবিবেচক প্রয়াস। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে প্রকৃতির বিভিন্ন পরিঘটনা এবং নানাবিধ কারকের ফলে সৃষ্টি হওয়া দুর্যোগসমূহ। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার ফলে প্রায়শই মানুষের জীবন এবং সম্পদ নষ্ট হতে দেখা যায়। এমনকি ভয়ংকর দুর্যোগের ফলে কোনো কোনো অঞ্চল বা নগর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হওয়ার বহু উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায়। তবুও একথা সত্য যে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ সচেতন ও সাবধান হ'লে এই ধরনের দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বা ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সম্ভব। সাম্প্রতিক কালে দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্যোগজনিত ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' নামে একটি বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগ প্রধানতঃ দুটি ধরণের—

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Disaster) এবং

২। মানবসৃষ্ট দুর্যোগ (Man-made disaster)।

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ প্রকৃতির বুকে অহরহ ঘটে চলা বিভিন্ন পরিঘটনা বা কারকের ফলে হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া যেসব দুর্যোগ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষতিসাধন করার সাথে সাথে জনজীবনেও বিপর্যয় ডেকে আনে, সেসবই হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিস্খলন, আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ, খরা বা অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দাবানল, শিলাবৃষ্টি, হিমস্খলন, সুনামি ইত্যাদি হ'ল প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যুগে যুগে মানুষ এবং অন্যান্য জীবকুল

এই দুর্যোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এসেছে। অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে হরপ্পাও মহেঞ্জোদারোর মত প্রাচীন সভ্যতাও এই ধরণের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ধ্বংস হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ৭৯ সনে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণের ফলে মনোরম পম্পেই শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল। মাত্র

অরুণাচল প্রদেশের টাৱাঙের ভূমিস্খলনের দৃশ্য

কয়েকবছর আগে জাপান, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষসহ মোট ১৮টি দেশের উপকূল অঞ্চলে সুনামির ফলে সৃষ্টি হওয়া ভয়াবহ ধ্বংসলীলার স্মৃতি এখনও আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে।

২। মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ঃ ঔদ্যোগিক দুর্ঘটনা, বিমান বা রেল দুর্ঘটনা, সন্ত্রাসবাদীর আক্রমন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি হ'ল মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড (Union Carbide) নামের কারখানাটিতে হওয়া গ্যাস দুর্ঘটনা, চার্নোবিল পারমাণবিক রিয়েক্টর দুর্ঘটনা, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস এবং ভারতবর্ষের মুম্বই, দিল্লী ও গুয়াহাটীর মত শহরগুলিতে ঘটে যাওয়া বৃহৎ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণগুলি মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ভয়াবহ ছবিটি প্রকট করে তোলে। সাধারণত একটি দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি হওয়া সমস্যা বা প্রতিকূল প্রভাবগুলো হচ্ছে—

- স্বাভাবিক বা দৈনন্দিন জীবন-যাপনে ব্যাঘাত
- জরুরীকালীন সেবাসমূহে ঘাটতি

• মানুষের খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতি বা ব্যাঘাত।

নীচে উল্লেখ করা বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যই দুর্যোগ এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

• দুর্যোগের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ দুর্যোগ বহু সময়ই অননুমেয় (Unpredictable)

• দুর্যোগের সঙ্গে আমাদের পূর্ব পরিচিতি থাকে না অর্থাৎ দুর্যোগগুলোর সঙ্গে আমরা অপরিচিত (Unfamiliar)

• দুর্যোগগুলো অতি ক্ষিপ্র (Speedy)

• দুর্যোগের সময় এবং স্থান অনিশ্চিত (Uncertain)

২০১৫ র নভেম্বর মাসে সংঘঠিত গুয়াহাটির ফ্যান্সিবাজারের অগ্নিকাণ্ড

• দুর্যোগগুলো অতি শক্তিশালী হওয়ার ফলে জীবন ও সম্পত্তির বিস্তর ক্ষতি সাধন করে।

আশির দশক থেকে আজ অবধি ভারতবর্ষে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্যোগসমূহের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল ঃ

ভারতবর্ষের ভয়াবহ দুর্যোগসমূহ ঃ

দুর্যোগ	স্থান	সময়
১। ভূপাল গ্যাস দুর্যোগ	মধ্যপ্রদেশ	ডিসেম্বর ১৯৮৪
২। উত্তর কাশী ভূমিকম্প	উত্তরাঞ্চল	অক্টোবর ১৯৯১
৩। লাটুর ভূমিকম্প	মহারাষ্ট্র	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
৪। সুপার সাইক্লোন	উড়িষ্যা	অক্টোবর ১৯৯৯
৫। ভূজ ভূমিকম্প	গুজরাট	জানুয়ারী ২০০১
৬। কোশী বন্যা	বিহার	আগষ্ট ২০০৪
৭। সুনামি	কেরালা, তামিলনাড়ু পণ্ডিচেরী, অন্ধ্রপ্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	ডিসেম্বর ২০০৪
৮। ভূমিকম্প	জম্মু ও কাশ্মীর	অক্টোবর ২০০৫
৯। বন্যা	বিহার	আগষ্ট ২০০৮
১০। গুয়াহাটি ধারাবাহিক বিস্ফোরণ	অসম	অক্টোবর ২০০৮
১১। মুম্বাই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ	মহারাষ্ট্র	নভেম্বর ২০০৮
১২। সাইক্লোন আয়লা	পশ্চিমবঙ্গ	মে' ২০০৯
১৩। বন্যা	অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক	অক্টোবর ২০০৯
১৪। বন্যা ও ভূমিস্খলন	উত্তরাখণ্ড	জুন ২০১৩
১৫। বন্যা	কাশ্মীর	সেপ্টেম্বর ২০১৪

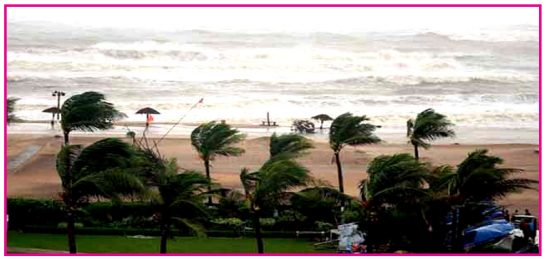

উড়িষ্যার গোপালপুরের সামুদ্রিক ঝড়

ভারতবর্ষে খনি দুর্ঘটনা ঃ

ভারতবর্ষে বহু খনি আছে। এই খনিগুলিতে বিভিন্ন সময়ে অকস্মাৎ কিছু অনাকাঙ্খিত দুর্যোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ধরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা এবং সেগুলির কারণ নীচে দেওয়া তালিকায় উল্লেখ করা হ'ল।

তারিখ	খনি	মৃত্যুর সংখ্যা	কারণ
মার্চ ১৯৭৩	নুনীদিহ	৪৮	বিস্ফোরণ
আগষ্ট ১৯৭৫	কেসরগড়	১১	ছাদখসে পড়া
ডিসেম্বর ১৯৭৫	চাসনালা	৩৭৫	জলপ্লাবন
অক্টোবর ১৯৭৬	সুদামদিহ শাফ্ট	৪৩	বিস্ফোরণ
জানুয়ারী ১৯৭৯	বরাগোলাই	১৬	বিস্ফোরণ
জুন ১৯৮১	জগন্নাথ	১০	অগ্নিকাণ্ড
জুলাই ১৯৮২	চৌপা	১৬	ছাদ খসে পড়া
নভেম্বর ১৯৯৩	টিপং	৯	বিস্ফোরণ
জানুয়ারী ১৯৭৪	নিউ কেন্দা	৫৫	অগ্নিকাণ্ড
সেপ্টেম্বর ১৯৯৫	গেচলিটেণ্ড	৬৪	জলপ্লাবন

দুর্যোগ ব্যবস্থা ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি আমাদের জীবনে অভাবনীয় দুঃখ-দুর্দশা বহন করে আনে। কিন্তু এর জন্য শুধু নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে বসে থাকা উচিত নয়। বিশ্বের সব দেশই দুর্যোগ প্রশমনের জন্য বিশেষ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশ্বের সর্বাধিক ভূমিকম্পপীড়িত দেশগুলির অন্যতম হচ্ছে জাপান। কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দমন করে জাপান নিজেকে বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধ। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে পুরোপুরি রোধ করা যায় না কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সতর্ক ও সচেতন থাকলে দুর্যোগ প্রশমন অনেক সহজ হয়। অন্যদিকে আমাদের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা আমরা মানবসৃষ্ট দুর্যোগগুলিকে বহু পরিমানে রোধ করতে পারি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার তিনটি স্তর থাকে।

১। দুর্যোগ পূর্বপর্তী স্তর (সাবধানতা, জনসচেতনতা, পূর্বানুমান, প্রস্তুতি ইত্যাদি)

২। দুর্যোগকালীন স্তর (দুর্যোগের প্রকার অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা, উদ্ধার কার্য ইত্যাদি)

৩। দুর্যোগ পরবর্তী স্তর (সাহায্য, পুনঃসংস্থাপন, রাস্তাঘাট যোগাযোগ পুর্ণনির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ছাত্র-ছাত্রীর ভূমিকা (Role of students in Disaster management) ঃ

ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য এবং অতি সংবেদনশীল অঙ্গ। ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যত নাগরিক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এই ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যেমন—

১। স্কুল-কলেজ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে যে সমস্ত পরামর্শ বা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সে সমস্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য নিজের পরিবারকে প্রস্তুত করে তুলতে পারে।

২। প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির মধ্যে সবথেকে বেশী ভয়াবহ হ'ল ভূমিকম্প, এটির পূর্বানুমান অতি দুরূহ এবং এটি অতি ক্ষিপ্র। ভূমিকম্পের সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে বিশেষজ্ঞদের দেওয়া পরামর্শসমূহ পালন করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

৩। ভূমিকম্পের সময় দরজার চৌকাঠ, ঘরের কোণ, মজবুত টেবিল বা বিছানার নীচে অথবা খোলা জায়গায় আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন।

৪। বিদ্যুতের তার অথবা গাছের তলায়, জলের ট্যাংক অথবা কাঁচের জানালার কাছে, রান্নাঘর বা স্নানাগারে আশ্রয় নেওয়া অতি বিপজ্জনক।

৫। শোওয়া, বসা বা পড়ার ঘরে সহজে উল্টে পড়া জিনিস যেমন আলমারী, বইয়ের র‍্যাক ইত্যাদি নিরাপদ দূরত্বে ভালোবাবে রাখা উচিত।

৬। বাড়ীর মূল দরজার কাছে একটি ব্যাগে জল, কিছু শুকনো খাবার, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস, একটি হুইসেল, টর্চ ইত্যাদি ঢুকিয়ে রাখা উচিত যাতে জরুরী প্রয়োজনে দুর্যোগের সময় সেগুলি ব্যবহার করা যায়।

৭। অগ্নি নির্বাপক বাহিনী, জেলা প্রশাসন, অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী ইত্যাদির ফোন নম্বর হাতের কাছে অথব্য মোবাইল ফোনে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। আজকাল প্রশাসনের তরফে 'ডায়াল-১০০' বা এই ধরণের কিছু জরুরী নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে।

৮। বন্যাপ্রবন অঞ্চলে বন্যার জন্য অগ্রিম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে খাদ্য, প্রাথমিক চিকিৎসা, টর্চ, পানীয় জল ইত্যাদি মজুত রাখা প্রয়োজন। বন্যার সম্ভাবনা দেখা দিলে কলাগাছের ভেলা তৈরী রাখা উচিত।

৯। রেডিও, দূরদর্শন ইত্যাদিতে সম্প্রচারিত খবরের মাধ্যমে বন্যা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি, সুনামি ইত্যাদির পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

১০। এই সব ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা জারী করা নিষেধাজ্ঞাসমূহ মেনে চলা উচিত।

বন্যার সময়ে কলাগাছের ভেলার ব্যবহার

১১। আগুনে পোড়া, সাপে কামড়ানো, মৌমাছির কামড়, গ্রীষ্ম-দাহ (Heat Stroke), বিদ্যুৎ প্রবাহ, বিষক্রিয়া, কুকুরের কামড়, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কী কী প্রাথমিক সতর্কতা প্রয়োজন সেই বিষয়ে দৈনিক সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিক মাধ্যম (Electronic media) গুলিতে প্রায়ই আলোচনা হয়। সেগুলো ভালোভাবে শুনে প্রয়োজনীয় কথাগুলো নোটবুকে লিখে রাখলে জরুরী প্রয়োজনে যথেষ্ট সাহায্য হয়।

জনসাধারণের উপকারের জন্য আরক্ষী বা অন্যান্য বিভাগের নির্দিষ্ট টোল ফ্রী নম্বর থাকে। আমাদের রাজ্যের, বিশেষত গুয়াহাটীর টোল ফ্রী নম্বর হ'ল '100'। সব রাজ্যেই দুর্যোগের সময় এই ধরনের আরও কিছু টোল ফ্রী নম্বর জারী করা হয়। রাস্তাঘাটে সন্দেহজনক অথবা বিপজ্জনক কোনো জিনিস দেখলে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানালে জনসাধারণের অনেক উপকার হয়। এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সম্ভাব্য দুর্যোগের আশঙ্কা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা টোল ফ্রী নম্বরের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত করাতে পারে। যেমন—

১। পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আরক্ষী বিভাগ বা ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স সেবাকে অবগত করানো।

২। অভিভাবকহীন জিনিসপত্র, প্যাকেট, ব্যাগ ইত্যাদি দেখতে পেলে আৰক্ষী বিভাগকে জানানো।

৩। বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে থাকা বিদ্যুতের তার, খুঁটি, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদির থেকে আগুনের ফুলকি বেরোতে দেখলে বিদ্যুৎ বিভাগকে খবর দেওয়া।

৪। ফুটপাথে ঢাকনা না থাকা ম্যানহোল (Manhole), বিপজ্জনকভাবে ভেঙে থাকা গাছ বা অট্টালিকার অংশ দেখতে পেলে পৌরসভা বা পৌর নিগমকে জানানো।

৫। রেল লাইনে কোনো ধরণের বিচ্যুতি দেখলে রেল বিভাগকে জানানো।

৬। রেল ভ্রমণকালীন কোনো ধরণের বিপদের সন্মুখীন হ'লে 'জি আর পি'র টোল ফ্রী নম্বরে ফোন করে খবর দেওয়া ইত্যাদি কাজে ছাত্র-ছাত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

উদ্ধার এবং সন্ধান কার্যে কয়েকটি আবশ্যকীয় পদক্ষেপ ঃ

- উদ্ধারকারীদের শান্ত কিন্তু দৃঢ় হয়ে থাকা প্রয়োজন।
- উদ্ধারকার্যের আগে বিস্তৃতভাবে তল্লাসি করা উচিত।

- দুর্ঘটনাস্থানের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে সাবধানে উদ্ধারকার্য আরম্ভ করা উচিত।
- ক্ষয়-ক্ষতির প্রকৃত পরিমান পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।
- প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা তৈরী থাকা উচিত।
- আহত লোকেদের প্রথমে সাহায্য করা উচিত।
- আঘাতপ্রাপ্ত লোকজনকে কম্বল বা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে আনা উচিত যাতে আঘাতের পরিমান বেড়ে না যায়।
- দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোকজনের উদ্ধারের সময় ধারালো সরঞ্জামের ব্যবহার সাবধানে করা উচিত।
- আহতদের পরিধানের কাপড় ঢিলে করে দিয়ে আরামদায়ক জায়াগায় রাখা উচিত।
- প্রয়োজন সাপেক্ষে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

দুর্যোগের সময় যা করা উচিত নয় ঃ

- সন্ত্রস্ত বা ভীত হওয়া উচিত নয়।
- প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই উদ্ধার কার্যে হাত দেওয়া উচিত নয়।
- ধ্বংসস্তুপের থেকে কাঠ বাঁশ ইত্যাদি অসাবধানে টেনে সরানো উচিত নয়, এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান আরও বাড়তে পারে।
- দুর্ঘটনাস্থানে অসাবধানে ঘোরাফেরা করে ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন করে বিপদে ফেলা উচিত নয়।
- অত্যন্ত জরুরী না হ'লে দুর্ঘটনা স্থানটির উপর দিয়ে যাওয়া আসা না করা উচিত।
- বিদ্যুৎবাহী ইলেকট্রিক তারের স্পর্শ এড়িয়ে উদ্ধার কার্য করা উচিত।
- উদ্ধারকারী দলটি যেন কোনভাবেই সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘন না করে।

ভারতবর্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টাসমূহ ঃ

বিশাল উপকূলবর্তী অঞ্চল, ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার আধিক্য এবং মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালি আচরণের ফলে ভারতবর্ষ প্রায় প্রত্যেক বছরই বিভিন্ন দুর্যোগের কবলে পড়ে। ভারতের অন্তত সাতাশটি রাজ্যে বন্যা, অনাবৃষ্টি,

অতিবৃষ্টি, ভূমিস্খলন, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব অতি বেশীমাত্রায় দেখা যায়। ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় ৮৫% অঞ্চলে এই দুর্যোগগুলির প্রভাব দেখা যায়। ভারতের ৬০% অঞ্চল ভূমিকম্প, ৬৮% অঞ্চল খরা বা অনাবৃষ্টি, ১২% অঞ্চল বন্যা এবং ৮% অঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

এই ধরণের দুর্যোগের মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকার ১৯৯৯ সনে জেলা, রাজ্যিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতি স্থাপন করেন, কিন্তু ১৯৯৯ সনের ২৯ ও ৩০ অক্টোবরে উড়িষ্যার সুপার সাইক্লোন ও ২০০১ সনের ২৬ জানুয়ারীতে গুজরাটের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সময় ভারত সরকারের দুর্যোগ সজাগতা ও জরুরীকালীন সাহায্যপ্রদান ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ভীষণভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। ভারত সরকারের দ্বারা গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রাষ্ট্রীয় সমিতি পূর্বোক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতির দাখিল করা রিপোর্টের ভিত্তিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেন এবং সেই প্রস্তাব অনুসারে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রাথমিক দায়িত্ব কৃষি মন্ত্রালয় থেকে গৃহ মন্ত্রালয়ে স্থানান্তর করা হয়।

২০০৪ সনের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে ভারতের উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে ভয়ঙ্কর সুনামির ফলে হাজার হাজার লোকের প্রাণনাশের পরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই সময় সংসদের দুটি সদনেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫' গঠন করে দুর্যোগের আগের ও পরের করণীয় কাজগুলি জরুরীভিত্তিতে করার ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৫ সনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের পরিকল্পনা মতে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রশমন প্রাধিকরণ (National Disaster Management Authority – NDMA), রাজ্যিক দুর্যোগ প্রশমন প্রাধিকরণ (State Disaster Management Authority – SDMA) এবং জেলা দুর্যোগ প্রশমন প্রাধিকরণ (District Disaster Management Authority – DDMA) স্থাপন করা হয় এবং এই প্রাধিকরণগুলির সভাপতিত্ব যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও উপায়ুক্তদের অর্পণ করা হয়।

ইতিমধ্যে দুর্যোগের মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ বাহিনী অর্থাৎ (National Disaster Response Force – NDRF) নামে একটি উৎসর্গীকৃত বাহিনী স্থাপন করা হয়। এই বাহিনীর সদস্যদের অর্ধসামরিক বাহিনীর থেকেই নির্বাচিত করা হয়। NDRF বাহিনীর আটটি ব্যাটেলিয়ান স্থাপন

করে দুর্যোগপ্রবন অঞ্চলগুলিতে (Strategic area) নিয়োজিত করা হয়। NDRF এর সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে রাসায়নিক, জৈবিক, তেজস্ক্রিয় এভং আণবিক দুর্যোগের মোকাবিলা করার জন্য সক্ষম করে তোলা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই বাহিনী স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য করে। এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষে "The National Institute for Disaster Management (NIDM)" নামে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ বাহিনীর আটটি ব্যাটেলিয়নের তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

ক্রমিক নং	NDRF ব্যাটেলিয়ান	রাজ্য	কেন্দ্রীয় অর্ধ সামরিক বাহিনী
১	NDRF ব্যাটেলিয়ন গ্রেটার নইডা	উত্তর প্রদেশ	ITBP
২	NDRF ব্যাটেলিয়ন ভাটিণ্ডা	পাঞ্জাব	ITBP
৩	NDRF ব্যাটেলিয়ন কলকাতা	পশ্চিমবঙ্গ	BSF
৪	NDRF ব্যাটেলিয়ন গুয়াহাটী (পাটগাঁও)	অসম	BSF
৫	NDRF ব্যাটেলিয়ন মুনদালী	উড়িষ্যা	CISF
৬	NDRF ব্যাটেলিয়ন আরাক্কোনাম	তামিলনাড়ু	CISF
৭	NDRF ব্যাটেলিয়ন পুনে	মহারাষ্ট্র	CRPF
৮	NDRF ব্যাটেলিয়ন গান্ধীনগর	গুজরাট	CRPF

অসম রাজ্যিক দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাধিকরণ ঃ

২০০৫ সনের রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন অনুসারে অসম সরকার দুর্যোগ প্রশমনের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ২০১০ সনে অসমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী

কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্যের যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করা, এই ব্যাপারে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা এবং দুর্যোগের পরবর্তী পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মসূচী তৎপরতার সঙ্গে পরিচালনা করার জন্য রাজ্যিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অভিকরণ অর্থাৎ Assam State Disaster Management Agency (ASDMA) স্থাপন করা হয়। এর মুখ্য কার্যালয় গুয়াহাটির (দিসপুর) রাজ্যিক সচিবালয়ে অবস্থিত। ভারতীয় প্রশাসনীয় সেবার (IAS) সচিব পর্যায়ের

উদ্ধার অভিযানরত SDRF-এর জোয়ান

অফিসারদের থেকে কোনও একজনকে এই সংস্থাটির মুখ্য কার্যবাহী অফিসার এবং যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজনকে প্রকল্প অফিসারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই সংস্থাটির অধীনে কেন্দ্রীয় প্রাধিকরণের বাইরেও জেলা, ব্লক বা পঞ্চায়েত পর্যায়ে দুর্যোগ প্রশমনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অভিকরণটির মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল—

১। পরিকল্পনা (Planning)
২। প্রস্তুতি (Preparation)
৩। কার্যকরণ (Operation)
৪। সমন্বয় (Co-ordination)
৫। জনসাধারণের অংশগ্রহণ (Community Participation)

অসম রাজ্যিক দুর্যোগ প্রতিরোধ বাহিনী (SDRF) ঃ

অসমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সার্থক কর্মসূচী (effective mechanism) তৈরী করার উদ্দেশ্যে অসম সরকার ২০১০ সনে একটি 'রাজ্যিক দুর্যোগ

প্রতিরোধ বাহিনী' গঠন করেছেন। রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ বাহিনীর সমান্তরালভাবে গঠন করা অসম সরকারের অধীনস্থ এই বাহিনীর কার্যালয় উত্তর গুয়াহাটির সমীপে 'শিলা' নামের জায়গাটিতে অবস্থিত। এই বাহিনীটি অসম রাজ্যিক অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর সঞ্চালকের অধীনস্থ। রাজ্যিক অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে দুর্যোগের সময়ে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য সম্পাদন করতে এই বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও বিভিন্ন দুর্ঘটনা যেমন অগ্নিকাণ্ড, নৌকোডুবি ইত্যাদিতেও এই বাহিনী বিশেষ সাহায্য প্রদান করে থাকে।

চীনদেশে প্রচলিত একটি প্রবাদে বলা হয় যে

"যদি একবছরের জন্য পরিকল্পনা কর, তাহ'লে ধানের চাষ কর
যদি দশবছরের জন্য পরিকল্পনা কর, তাহ'লে বৃক্ষরোপণ কর।
যদি একশো বছরের পরিল্পনা করে থাকো, তাহ'লে মানুষকে শিক্ষিত কর।"

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত ভয়াবহ সমস্যা প্রশমন এবং এর থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য হ্রস্ব ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সঙ্গে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রশাসন এবং জনসাধারণ একত্রিত হয়ে কাজ করলে বিশেষ সুফল লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্নাবলি

১। দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুটি মানবসৃষ্ট দুর্যোগের নাম লেখ।
২। অসম বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণ কী কী?
৩। ভারতবর্ষ বিভিন্ন কৃত্রিম দুর্যোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার তিনটি কারণ লেখ।
৪। মানবসৃষ্ট দুর্যোগ কী ভাবে উপশম করা যায়? তোমার নিজস্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে তিনটি উপায় লেখ।
৫। দুর্যোগের ফলে কোন কোন দিকে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটে?
৬। দুর্যোগের আগে ও পরে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

৭। বিগত দুটি দশকে দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রকৃত এবং প্রধান কারণ কী কী?
৮। বিশ্বের সবথেকে বড় ভূমিকম্প দুটি কোন স্থানে এবং কখন সংঘটিত হয়েছিল?
৯। অসমে বর্তমান সময়ে প্রায়ই বন্যা হওয়ার মূল কারণ কী?
১০। ভূমিকম্পের সঙ্গে জড়িত সম্ভাব্য পাঁচটি সমস্যা কী কী?
১১। অসম রাজ্যিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগটির কার্য ও উদ্দেশ্য কী?
১২। তোমার চোখের সামনে ঘটা মানবসৃষ্ট দুর্যোগগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তুমি কী কী ব্যবস্থা নেবে অথবা কীভাবে এই বিষয়ে সচেতনতা লাভ করবে?
১৩। ২০০৮ সনে সংঘটিত গুয়াহাটি ধারাবাহিক বিস্ফোরণটি কোন শ্রেনির দুর্যোগ?
১৪। ভারতবর্ষের খনি দুর্ঘটনার বিষয়ে সংক্ষেপে লেখ।
১৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্তর কয়টি এবং কী কী? এই স্তরগুলিতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন?
১৬। একজন ছাত্র বা ছাত্রী হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তোমার করণীয় পাঁচটি পদক্ষেপ কী কী?
১৭। দুর্যোগের সময় কী কী করা উচিত নয়?
১৮। রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ বাহিনীর (NDRF) বিষয়ে সংক্ষেপে লেখ।
১৯। অসম রাজ্যিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অভিকরণ কী?
২০। অসমের রাজধানী শহর গুয়াহাটি বর্তমানে ভূমিস্খলনের সমস্যায় জর্জরিত। এর কারণ কী বলে মনে কর? তোমার যুক্তিতে এই ভূমিস্খলন রোধ করতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

তৃতীয় ভাগ
পথ সুরক্ষা

একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হ'ল যে এর অধিকাংশই মানবসৃষ্ট সমস্যা, বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ, অবৈধ ড্রাগ ব্যবহার ইত্যাদি সমস্যা আজকের পৃথিবীতে প্রত্যাহ্বানের সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যাগুলির মতোই পথ সুরক্ষা সমস্যাও সাম্প্রতিক কালে সমগ্র বিশ্বের জন্যই একটি চিন্তনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। ক্রমবর্ধমান হারে ঘটতে থাকা পথ দুর্ঘটনার বিষম পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই নিজস্বভাবে কিছু কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক নাগরিকেরই পথ সুরক্ষা সম্পর্কীয় সজাগতা আহরণ করা প্রয়োজন।

পথ সুরক্ষা বলতে কি বোঝায় ঃ

পথ সুরক্ষা বললে রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানোর সময়, গাড়িতে যাত্রী হিসেবে যাত্রা করার সময়, সাইকেল চালানোর সময়, হাঁটা চলা করার সময়, রাস্তা পার হওয়ার সময়, গাড়িতে ওঠানামার সময় সাবধানতা অবলম্বন করে বিপদ-দুর্ঘটনা ইত্যাদি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা বোঝায়। অর্থাৎ রাস্তা ঘাটে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলাচল করে সুরক্ষিত ভাবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছনোই হ'ল পথ সুরক্ষা।

পথ দুর্ঘটনার কারণ ঃ

বিভিন্ন অধ্যয়নের প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যমতে পথ দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণ হ'ল— সুরাপান করে গাড়ি চালানো, তীব্রগতি, ঘুমের অভাব, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, খারাপ আবহাওয়া, গাড়ির যান্ত্রিক গণ্ডগোল, পথ নির্দেশনা ভঙ্গ করা ইত্যাদি।

পথ দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণগুলি নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'ল—

মানবীয় কারক (Human Factor) ঃ

প্রকাশিত তথ্য মতে ৮৫ শতাংশ পথ দুর্ঘটনা মানুষের ভুলেই সংঘটিত হয়। সুরার নেশা, ঘুমের আবেশ, অন্যমনস্কতা, পথ নির্দেশনা বুঝতে ভুল হওয়া

অথবা অমান্য করা, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা, পথচারীর অমনোযোগিতা বা ভুল দিকে হাঁটা, রাস্তা পার হওয়ার সময় মোবাইলে কথা বলা ইত্যাদি বিভিন্ন মানবীয় ভুলের জন্য বহু পথ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

আন্তর্গঠনমূলক কারক (Infrastructural Factor) ঃ

ক্ষতিগ্রস্ত বা অসমান রাস্তা, রাস্তা নির্মাণে প্রযুক্তিগত ত্রুটি ইত্যাদিও পথ দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

যান্ত্রিক কারক (Mechanical Factor) ঃ

চলমান গাড়িতে হঠাৎ কোনো যান্ত্রিক গোলমাল, গাড়ির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, পুরনো বা বিকল যন্ত্রাংশ ব্যবহার ইত্যাদির ফলেও পথ দুর্ঘটনা হতে দেখা যায়।

পারিপার্শ্বিক কারক (Environmental Factor) ঃ

অন্যান্য কারণ ছাড়াও খারাপ আবহাওয়া, প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থিতি, আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেও পথ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সম্প্রতি পথ সুরক্ষা জনিত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য দেশজুড়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। পথ সুরক্ষার চারটি কৌশলকে (সেগুলির ইংরাজী নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী) '4E' বলে বোঝানো হয়। এই কৌশল চারটি হ'ল—

(ক) কারিগরী বিদ্যা (Engineering) ঃ আমাদের রাস্তাঘাটে পথচারী ছাড়াও সাইকেল, পশুচালিত গাড়ি, রিক্সা, বাস, ট্রাক, ব্যক্তিগত ছোট চার চাকাযুক্ত গাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির বাহন দেখা যায়। এজন্য এই সমস্ত শ্রেণির যানবাহন চলাচলের কথা ভেবে আমাদের রাস্তাঘাটসমূহ বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরী করা প্রয়োজন। ঠিক সেভাবেই বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরী গাড়ির ব্যবহার পথ সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

যান বাহন চলাচলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিধি নিষেধ এবং নিয়মাবলী প্রবর্তন এবং সেগুলির বলবৎকরণ বলিষ্ঠভাবে করলে পথ দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

(গ) শিক্ষা (Education) ঃ পথ সুরক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন কৌশল, পথ-বিধান, পথচিহ্ন, পথ-নির্দেশ ইত্যাদির বিষয়ে জনসাধারনের মধ্যে প্রচার করে সকলকে সুশিক্ষিত করতে পারলে পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(ঘ) জরুরীকালীন পরিষেবা (Emergency) ঃ পথ দুর্ঘটনায় আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারলে হতাহতের সংখ্যা কমানো সম্ভব। এজন্য জরুরীকালীন চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা উন্নতকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

পথ সুরক্ষা প্রকল্প ঃ

সাম্প্রতিক পৃথিবীতে পথ দুর্ঘটনা একটি ব্যাপক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রত্যেকটি দেশেই পথ দুর্ঘটনার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পথ সুরক্ষা সম্বন্ধীয় নিজস্ব কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। পথ সুরক্ষাজনিত নিয়মাবলী বা আদব-কায়দা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়াটা প্রত্যেকজন সুনাগরিকের কর্তব্য। বিশেষভাবে ছাত্রসমাজের কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে তাঁরা এইসব নিয়মাবলী সম্পর্কে সুশিক্ষিত হয়ে সমাজের অন্য ব্যক্তিদের এ-সম্পর্কে অবহিত করে পথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কাজে অগ্রণী হবেন।

ভারতবর্ষে ১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছরের জানুয়ারী মাসে 'পথ সুরক্ষা সপ্তাহ' উদযাপন করা হয়ে আসছে। এই উদযাপন উপলক্ষে জনসাধারনের মধ্যে সজাগতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে সারা পৃথিবী জুড়ে "দ্য গ্লোবাল প্ল্যান ফর দ্য ডিকেড অফ অ্যাকশন ফর রোড সেফটি ২০১১-২০২০ (The Global plan for the decade of action for road safety 2011-2020) শীর্ষক দশকজোড়া কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১১ সনের ১১ মে এই কার্যসূচী আরম্ভ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর আধারে প্রত্যেকটি দেশ দৃঢ়ভাবে পথ সুরক্ষা সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন কার্যপন্থা গ্রহণ করেছে। ২০১০ সনের মার্চ মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ঘোষিত এই কর্মসূচীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হ'ল পথ দুর্ঘটনার ফলে হওয়া ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিম্নমুখী করা। উল্লেখ্য যে বর্তমানে ঘটতে থাকা পথ দুর্ঘটনা পরিস্থিতি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ না করলে ২০২০ সনে সমগ্র পৃথিবীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ১৯ লাখ স্পর্শ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়।

ভারতেও ২০০৫ সনে গঠিত "সুন্দর কমিটি"র দেওয়া পরামর্শাবলির ভিত্তিতে ২০১০ সনের ১৫ মার্চ তারিখে রাষ্ট্রীয় পথ সুরক্ষা প্রকল্প কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর অন্তর্গত ১১ টি কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম হ'ল পথ সুরক্ষা সম্পর্কে সজাগতা।

পথ দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছু ভয়াবহ পরিসংখ্যান ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ১২.৫ লক্ষ ব্যক্তি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এছাড়াও প্রায় ৫০ লাখ লোক প্রতিবছর আহত হন। এই দুর্ঘটনার প্রায় ১০ শতাংশ ভারতে সংঘটিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক কথা হ'ল পৃথিবীর মোট গাড়ির মাত্র ১ শতাংশই ভারতে আছে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি পথ দুর্ঘটনা ভারতবর্ষে ঘটে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী

• আমাদের দেশে ২০১৪ সনে সংঘটিত ৪,৫০,৮৯৮ টি পথ দুর্ঘটনায় ১,৪১,৫২৬ জনের মৃত্যু হয় এবং ৪,৭৭,৭৩১ জন গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন।

• এদেশে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ৫১ টি পথ দুর্ঘটনা ঘটে এবং ১৬ জনের প্রাণহানি হয়। অর্থাৎ প্রতি চার মিনিটে একজন পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

• দু-চাকাযুক্ত বাহন ব্যবহারকারীদের প্রায় ২৬.৪ শতাংশ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

• পথ দুর্ঘটনার ২৭.৫ শতাংশ রাষ্ট্রীয় সড়কে (National Highway) এবং ২৫.৩ শতাংশ রাজ্যিক সড়কে (State Highway) সংঘটিত হয়।

• ৩৬.৮ শতাংশ পথ দুর্ঘটনা তীব্র গতিতে গাড়ি চালানোর ফলে ঘটে থাকে।

• ৩.২ শতাংশ দুর্ঘটনা খারাপ আবহাওয়ার ফলে ঘটে।

• দেশে সংঘটিত পথ দুর্ঘটনার ৫৪.৭ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে ও ৪৫.৩ শতাংশ নগর অঞ্চলে সংঘটিত হয়।

অসমের ক্ষেত্রে ঃ

• আমাদের রাজ্যে ২০১৪ সনে মোট ৭,১৪৪ টি পথ দুর্ঘটনায় ২৫২২ জন নিহত এবং ৬৫০০ জন আহত হন। উল্লেখ্য যে পথ দুর্ঘটনার বহু ঘটনা পঞ্জীয়নভুক্ত না হওয়ায় প্রকৃত পরিসংখ্যান উপরোক্ত পরিসংখ্যানের তুলনায় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পথ বিধান ঃ

যদিও যান-বাহন বিধি পালন করা চালকদের জন্য বাধ্যতামূলক, তবুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিধিবদ্ধ নির্দেশনা না মেনে বিপদ ডেকে আনার প্রবণতা দেখা যায়। গাড়ি চালকদের দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গাড়ি চালকদের যান বাহন আইনে সন্নিবিষ্ট পথ নিয়ম (Traffic rules) সমূহ জানা এবং মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। এ-ধরনের কিছু প্রয়োজনীয় পথ বিধান নীচে দেওয়া হ'ল।

১। গাড়ি যথাসম্ভব রাস্তার বাঁদিকে ঘেঁষে চালানো এবং বিপরীত দিকের থেকে আশা যানবাহনকে নিজের ডানদিক দিয়ে অতিক্রম করতে দেওয়া উচিত।

২। বাঁদিকে গাড়ি ঘোরানোর সময় যথাসম্ভব বাঁদিক ঘেঁষে নতুন রাস্তায় উঠতে হবে। ডানদিকে ঘোরানোর সময় রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে নতুন রাস্তাটির বাঁদিক ঘেঁষে প্রবেশ করতে হবে।

৩। একদিকে চলতে থাকা গাড়িকে ডানদিক দিয়ে অতিক্রম করতে হবে।

৪। নীচে দেওয়া পরিস্থিতিতে একই দিকে এগোতে থাকা গাড়িকে অতিক্রম করা অনুচিত—

(ক) যদি অতিক্রম করার ফলে অন্য কোনো দিকের গাড়ির অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(খ) কোনো পথের সংযোগস্থলে অথবা পাহাড় ঘেঁষা অঞ্চলে যেখানে পথের সামনের দিকটি চোখের আড়ালে থাকে।

(গ) যখন বোঝা যায় যে পিছনের গাড়িটি ইতিমধ্যেই আপনার গাড়িকে অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছে।

(ঘ) যদি আগের গাড়িটি অতিক্রম করার অনুমতিসূচক সংকেত না দেয়।

৫। অন্যদিকে—

• যদি পিছনে থাকা গাড়িটি আপনাকে অতিক্রম করতে শুরু করে সেক্ষেত্রে কোনো কারনেই গতিবেগ বাড়ানো উচিত নয়।

• উপপথ থেকে মূল পথে যাওয়ার সময় যান-বাহন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকলে মূল পথে চলাচল করা গাড়িকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

• অ্যাম্বুল্যান্স, অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর গাড়ি এবং ভি.আই.পি যাত্রী থাকা গাড়িকে অগ্রাধিকার দেওয়া বাধ্যতামূলক।

৬। গাড়ি চালানোর সময় পিছন দিকের দৃশ্য আয়নায় দেখে প্রয়োজনসাপেক্ষে হাতের সাহায্যে সংকেত দিতে হবে।

৭। নীচে উল্লেখ করা স্থানগুলিতে গাড়ি রাখা উচিত নয়।

• পথের সংযোগস্থলে, পথের বাঁকে, সেতুর মাঝখানে বা পাহাড়ের উপরে।

• ট্রাফিক সিগনালে বা পথচারীর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়।

• মূল পথ বা পদ পথে।

• কোনো স্থির গাড়ির মুখোমুখি অথবা অন্য গাড়ির জন্য অসুবিধাজনক অবস্থানে।

• খণ্ডিত বা অখণ্ডিত রেখাঙ্কন থাকলে।

৮। "ওয়ান ওয়ে" লেখা রাস্তায় কখনোই উল্টো দিক থেকে গাড়ি চালানো উচিত নয়।

৯। উৎকট বা কর্কশ সুরের হর্ণ গাড়িতে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এছাড়াও যে সব জায়গায় সাইলেন্স জোন (Silence zone) লেখা থাকে সেখানে হর্ণ ব্যবহার করা অনুচিত। হাসপাতাল বা স্কুলের কাছে হর্ণ বাজানো নিয়মবিরুদ্ধ।

১০। রাস্তায় চলাচল করার সময় দুটি গাড়ির মধ্যে ব্যবধান থাকা প্রয়োজন যাতে একটি গাড়ি হঠাৎ থামলে অন্যটির সঙ্গে ধাক্কা না লাগে।

১১। পাহাড়ে ঠোনামার সময় উপরদিকে ওঠা গাড়িটিকে অগ্রাধিকার দিতে হয়।

১২। গাড়িতে ইন্ধন ছাড়া অন্য কোনো দাহ্য পদার্থ থাকা অনুচিত।

১৩। কোনো ইউনিফর্ম ধারী ব্যক্তি যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ কর্তব্যরত থাকলে সেই ব্যক্তির নির্দেশ মান্য করা প্রয়োজন।

১৪। রাস্তার পাশে দেওয়া পথচিহ্ন না মানা দণ্ডনীয় অপরাধ।

১৫। রক্ষী বা গেটবিহীন রেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় রেল বা ট্রলি আসছে কিনা তা ভালভাবে দেখা উচিত।

১৬। গাড়িতে চালকের আসনে বসার আগে ইন্ধন, জল বা অন্যান্য কারীগরী ব্যবস্থা যথাযথ আছে কি না পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন।

১৭। মাদক সেবন করে গাড়ি চালানো অনুচিত। এতে দুর্ঘটনা এবং যাত্রীর প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে।

১৮। গাড়ি চালানোর সময় কখনোই মোবাইল ফোনে কথা বলা উচিত নয়। জরুরী প্রয়োজনে গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে কথা বলতে হবে।

১৯। রাত্রে গাড়ি চালানোর সময় হেডলাইট নিম্নমুখী রাখা উচিত।

২০। গাড়ির সামনে শিশুদের রাস্তা পার হতে দেখলে গতিবেগ কমিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

২১। দৃষ্টিহীন বা শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্ত লোকজনকে রাস্তা পার হতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

শিরস্ত্রাণ বা হেলমেট (Helmet) ঃ

যান-বাহন আইন ১৯৮৮র ১২৯ ধারা অনুযায়ী দু'চাকাযুক্ত যান বাহনের চালক এবং আরক্ষীর জন্য হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। হেলমেট পরিধান চালক এবং আরোহীকে মৃত্যু ও মাথার গুরুতর আঘাতের হাত থেকে যথাক্রমে ৪০ শতাংশ ও ৭০ শতাংশ সুরক্ষা প্রদান করে। নিয়ম অনুযায়ী এই হেলমেটের মান "ব্যুরো অফ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড"-এর নির্ধারিত মানসম্পন্ন হওয়া জরুরী। দু-চাকার বাহনে চালকের পিছনে বসা যাত্রীর জন্যও হেলমেট ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। এর অন্যথা করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়।

সুরাসক্ত গাড়ি চালক ঃ

গাড়িচালকের সুরাপানের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে বহু পথ দুর্ঘটনা হয়ে থাকতে দেখা যায়। সুরাপায়ী গাড়ি চালক নিজের সঙ্গে অন্যের জন্যও দুর্ঘটনার আশংকা ও বিপদ ডেকে আনেন। রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে অতি সহজেই গাড়ির চালক নেশাগ্রস্ত কি না ধরে ফেলা যায়। গাড়ি চালানোর সময় কোনো ব্যক্তির রক্তের নমুনায় প্রতি ১০০ মিঃলি রক্তে ৩০ মিঃগ্রাঃ অথবা তার চেয়ে বেশি মাত্রায় অ্যালকোহল থাকলে যান-বাহন আইন অনুযায়ী সেই ব্যক্তির জেল অথবা জরিমানা (অথবা দুটোই) হতে পারে। এছাড়াও এই ধরনের অপরাধে ধরা পড়লে চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৮৫ শতাংশ পথ দুর্ঘটনাই সুরাপান করে গাড়ি চালানোর ফলে ঘটে থাকে।

গাড়ি চালানোর সময় মোবাইলের ব্যবহার ঃ

কোনো অবস্থাতেই গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। এই ধরনের অপরাধে ধরা পড়লে জরিমনা থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করার নিয়ম পর্যন্ত যানবাহন আইনে বলা হয়েছে।

স্কুল বাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি নিষেধ ঃ

অন্যান্য গাড়ির থেকে স্কুলবাস চালানোর বিষয়টি অনেক বেশি দায়িত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল। সেজন্য স্কুলবাস চালানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু বিধি নিষেধ প্রযোজ্য।

১। স্কুলবাস চালকের ৫ বছর ভারী যান-বাহন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

২। নীচে উল্লেখ করা অপরাধে কোনো চালক বছরে দুবারের বেশি অভিযুক্ত হ'লে স্কুলবাস চালানোর জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে।

(ক) লাল লাইট জ্বলতে থাকা সত্ত্বেও পথ সংযোগ স্থল অতিক্রম করলে।

(খ) নিষেধাজ্ঞা থাকা জায়গাতে পার্কিং করলে।

(গ) নীতি বিরুদ্ধভাবে অন্য গাড়িকে অতিক্রম (ওভারটেক) করলে।

(ঘ) কর্তৃত্বহীন ব্যক্তিকে গাড়ি চালানোর অনুমতি দিলে।

(ঙ) পথ সংযোগ স্থলে গাড়ি দাঁড় করানোর সময় রাস্তায় আঁকা Stopline চিহ্ন অতিক্রম করলে।

৩। কোনো স্কুল বাস চালক অত্যধিক বেগে বা সুরাসক্ত হয়ে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর অপরাধে একবার অভিযুক্ত হ'লেই স্কুল বাস চালানোর যোগ্যতা হারাবে।

৪। স্কুলবাস চালককে ইউনিফর্ম পরিধান করতে হবে এবং বাসের সামনে "স্কুল কর্তব্যরত" লেখা থাকতে হবে।

৫। বাসের গতিবেগ (অনূর্দ্ধ ৪০ কিঃমিঃ প্রতি ঘণ্টা) নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাসে গতি নিয়ন্ত্রক যন্ত্র (Speed governor) থাকা প্রয়োজন।

৬। শিক্ষিত লাইসেন্সধারী কণ্ডাক্টর থাকা বাধ্যতামূলক।

৭। স্কুল বাসে দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৮। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশমতে স্কুল বাসে অনুমোদিত আসন সংখ্যার ১.৫ গুণ ছাত্র-ছাত্রী ওঠানো যাবে অর্থাৎ ৩০ জনের আসনযুক্ত বাসে সর্বোচ্চ ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকতে পারবে।

পথচারীদের জন্য সুরক্ষাবিধি ঃ

পথসুরক্ষার ক্ষেত্রে পথচারী এবং ভ্রমণরত যাত্রীদেরও কিছু করণীয় থাকে। পথে চলাচল করার সময় পথচারীদের নীচে উল্লেখ করা কথা মেনে চলা উচিত।

১। রাস্তা পার হওয়ার সময় বাঁদিক এবং ডানদিক লক্ষ করা উচিত।

২। হাঁটার সময় পদপথ বা ফুটপাথ ব্যবহার করা উচিত। মূল রাস্তার উপর দিয়ে কখনও হাঁটা উচিত নয়।

৩। রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে হাঁটা উচিত।

৪। ছোট ছেলে মেয়েদের রাস্তায় একলা চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত নয়।

৫। পদপথে চলাচল করার সময় গর্ত বা অন্য কোনো বাধা আছে কি না দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

৬। থেমে থাকা গাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য গাড়ি আসছে কি না খেয়াল রাখতে হবে।

৭। দল বেঁধে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করা উচিত নয়।

৮। রাতে চলাচল করার সময় হাতে টর্চ লাইট থাকা প্রয়োজন।

৯। প্রাতর্ভ্রমণ করার সময় পিছন থেনে আসা গাড়ির থেকে সাবধান থাকা উচিত।

১০। রাস্তায় রাতে চলাচল করার সময় কালো রঙের পোষাকের চাইতে সাদা রঙের পোষাক নিরাপদ।

বাসে ভ্রমণ করার সময় ঃ

১। বেশি সংখ্যক যাত্রী থাকলে লাইন করে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বাসে ওঠা উচিত।

২। বাসে ওঠার সময় হাতল ধরে ওঠা উচিত। এবং বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে যাত্রা করা অনুচিত।

৩। দাহ্য পদার্থ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করা অনুচিত। চলন্ত বাস থেকে বাইরে থুথু ফেলা উচিত নয়।

৪। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অন্য যাত্রীর ওঠানামায় বাধা সৃষ্টি করবেন না।

৫। গাড়ির ছাদে বসে যাত্রা করা অথবা হাত বা মাথা বাইরে রেখে যাত্রা করা বিপজ্জনক।

৬। বাসের ভিতর ধূমপান বা মদ্যপান আইনবিরুদ্ধ।

৭। বাস সম্পূর্ণভাবে থামার পরে ওঠানামা করা উচিত।

৮। সঙ্গে থাকা জিনিসপত্র নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা উচিত। চালকের অসুবিধা হয় এমন জায়গায় মালপত্র রাখা উচিত নয়।

৯। গাড়ি চালানোর সময় চালকের সঙ্গে কথা কথাবার্তা বলে মনঃসংযোগ নষ্ট করা উচিত নয়।

১০। বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় সামনে ও পিছনে দেখা প্রয়োজন।

ধোঁয়া প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রমাণ পত্র (Pollution Under Control Certificate) ঃ

গাড়ির ধোঁয়া বায়ু প্রদূষণ ঘটায়। এজন্য সব গাড়িতে প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রমাণপত্র থাকা প্রয়োজন। যান-বাহন আইন অনুসারে গাড়ির প্রথম পঞ্জীয়ন

তারিখের থেকে একবছর সম্পূর্ণ হ'লে প্রত্যেক গাড়িকেই ৬মাস পর পর অনুমোদিত কেন্দ্রের থেকে পরীক্ষা করিয়ে প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথা এটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

সিট বেল্ট (Seat Belt) ঃ

ঘণ্টায় ৭০ কিঃমিঃ গতিতে চলতে থাকা গাড়ির চালক বা আরোহীদের শরীরও একই গতিতে ধাবমান হয়। হঠাৎ গাড়িটিকে থামতে হ'লে গাড়ির ভিতরে বসে থাকা যাত্রীদের শরীরও ঘণ্টায় ৭০ কিঃ মিঃ গতিতে সামনে থাকা ষ্টিয়ারিং হুইল, ড্যাশ বোর্ড বা সামনের কাঁচে (Wind shield) ধাক্কা মারতে পারে। এর ফলে গাড়ির চালক বা যাত্রীর মৃত্যুর অথবা চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

সমীক্ষায় প্রকাশ যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ৭০ শতাংশই সিট বেল্ট না লাগানোর পরিণতি। গাড়ির চালক এবং যাত্রীর সিটবেল্ট ব্যবহার না করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

ড্রাইভিং লাইসেন্স (Driving Licence) ঃ

কর্তৃত্বযুক্ত প্রাধিকারীর জারি করা যে অনুমতিপত্র ব্যবহার করে নির্দিষ্ট শ্রেণীর গাড়ি চালানো যায়, তাকেই ড্রাইভিং লাইসেন্স বলা হয়। অসমে জেলা পরিবহন অফিসার এই লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন গাড়ি চালানো দণ্ডনীয় অপরাধ। নিম্নোক্ত শ্রেণির যান-বাহন চালাতে হ'লে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রয়োজন।

- গিয়ারবিহীন মোটর সাইকেল
- গিয়ারযুক্ত মোটর সাইকেল
- প্রতিবন্ধীর বাহন
- লঘু যান বাহন
- যাত্রী পরিবহনের যান বাহন
- রোড রোলার
- নির্দিষ্ট ধরনের যান বাহন।

ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রার্থীর লাইসেন্স (Learner's Licence) নিয়ে গাড়ি চলোতে শেখা প্রয়োজন। এর পরবর্তী পর্যায়ে মূল লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ১৮ বছর বয়সের নীচে 'লার্নার্স লাইসেন্স' দেওয়া হয় না। অবশ্য ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সের ব্যক্তিরা পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সম্মতিসূচক স্বাক্ষরসহ গিয়ারবিহীন দু চাকার বাহন চালানোর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর জন্য ট্রাফিক সংকেত, পথচিহ্ন এবং পথ নিয়মসমূহের জ্ঞান যাচাই করা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। 'লার্নার্স লাইসেন্স পাওয়ার পরে গাড়ির সামনে এবং পিছনে ইংরাজী 'L' অক্ষরটি সাদার উপরে লাল অক্ষরে লিখে রাখতে হবে যাতে সেটি সহজেই নজরে আসে। এই লাইসেন্স যেহেতু গাড়ি চালানো শেখার জন্য দেওয়া হয় সেহেতু প্রশিক্ষণ নেওয়া চালকের সঙ্গে একজন ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ চালক বা প্রশিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক। গাড়ি চালাতে শিখে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে অথবা 'লার্নার্স লাইসেন্স' পাওয়ার পর অন্তত ৩০ দিন পরে গাড়ি চালানোর ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক গাড়ি চালানোর অনুজ্ঞাপত্র ঃ

কোনো ভারতীয় নাগরিক বিদেশে গাড়ি চালাতে হ'লে আন্তর্জাতিক গাড়ি চালনা অনুজ্ঞাপত্র (International Driving Permit) প্রদানের ব্যবস্থা যান বাহন আইনে সন্নিবিষ্ট আছে। এই অনুজ্ঞাপত্র একবছরের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। এটি পাওয়ার জন্য নীচে দেওয়া নথিপত্র সহ নির্ধারিত আবেদন ফর্মে আবেদন করতে হবে।

(ক) ভারতীয় ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রতিলিপি
(খ) পাসপোর্ট ও ভিসার প্রতিলিপি
(গ) চালকের সু-স্বাস্থ্যের প্রমাণ
(ঘ) তিন কপি ফটো
(ঙ) নির্ধারিত মাসুল

পথ দুর্ঘটনা ঘটলে কী করা উচিত ঃ

চালকের তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামানো উচিত। দুর্ঘটনাস্থল থাকা অন্য লোকজনের পক্ষে সম্ভব না হ'লে অথবা আহত ব্যক্তি বা তার অভিভাবকেরা

নিজ দায়িত্বে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না চাইলে চালকের উচিত আহতকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। সেইসঙ্গে কাছাকাছি থাকা পুলিশ থানায় দুর্ঘটনার খবর জানানো এবং বীমা কর্তৃপক্ষকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবগত করানো প্রয়োজন।

প্রধান যান বাহন আইনসমূহ ঃ

(ক) মোটর ভেহিকলস্ অ্যাক্ট (Motor Vehicles Act), ১৯৮৮

(খ) সেণ্ট্রাল মোটর ভেহিকলস্ অ্যাক্ট (Central Motor Vehicles Act) ১৯৮৯

(গ) অসম মোটর ভেহিকলস্ অ্যাক্ট (Assam Motor Vehicles Act) ২০০৩

(ঘ) অসম মোটর ভেহিকলস্ ট্যাক্সেশন অ্যাক্ট (Assam Motor Vehicles Taxation Act) ১৯৩৬

(ঙ) অসম মোটর ভেহিকলস্ ট্যাক্সেশন রুলস্ (Assam Motor Vehicles Taxation Rules) ১৯৩৬

গাড়িতে কী কী প্রয়োজনীয় নথিপত্র থাকা প্রয়োজন ঃ

ব্যক্তিগত গাড়িতে ঃ

- পঞ্জীয়ন প্রমাণ পত্র
- বীমা
- এক বছরের বেশি পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রে প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ সার্টিফিকেট
- ড্রাইভিং লাইসেন্স

ব্যবসায়িক (অপরিবাহক) গাড়িতে ঃ

উপরোক্ত নথিপত্র ছাড়াও

- উপযুক্ততার প্রমাণ পত্র
- পার্মিট বা অনুজ্ঞা পত্র
- পথকর প্রদানের রসিদ

- কণ্ডাক্টরের (বাসের ক্ষেত্রে) লাইসেন্স
- পার্মিটের সর্তে উল্লেখ থাকা অন্যান্য নথি।

ট্রাফিক লাইট (Traffic Light) ঃ

ট্রাফিক পয়েণ্টগুলিতে তিন ধরনের লাইট দেখতে পাওয়া যায়। লাল, হলুদ এবং সবুজ।

≠ লাল লাইটের অর্থ থামুন, যদি ষ্টপ লাইন থাকে তাহলে সেটিকে অতিক্রম করবেন না।

হলুদ লাইটের অর্থ থামার বা যাওয়ার জন্য তৈরী হোন।

সবুজ লাইটের অর্থ চলুন।

ট্রাফিক লাইটের সংকেত ঃ

লাল লাইট নিভতে বা জ্বলতে থাকলে থামুন, সামনের বাহন বা পথচারী পার হয়ে গেলে এগোন।

হলুদ লাইট জ্বলতে বা নিভতে থাকলে গতি কমান এবং সাবধানে এগোন

পথচিহ্ন (Road Sign) ঃ

পথের পাশে থাকা চিহ্নকে পথচিহ্ন বলে। এই চিহ্নের অর্থ গাড়ির চালক, পথচারী ছাড়াও প্রত্যেক পথ ব্যবহারকারীর জানা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালে

সুরক্ষার বিষয়টি United Nations Economic Commission of Europe (UNECE)-এর মুখ্য উদ্দেশ্য তালিকায় স্থান দিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কর্মী বাহিনী (Working group) গঠন করা হয়।

১৯৪৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে জেনিভায় UNECE-র অধীনে অনুষ্ঠিত কর্ম পদ্ধতি সম্মেলনে পথ সংকেত ও চিহ্নের উপর একটি দস্তাবেজ গ্রহণ করা হয় এবং ২০ ডিসেম্বর ১৯৫৩ সাল থেকে এটিকে বলবৎ করা হয়। ভারতবর্ষ এর একটি অংশীদার। এই সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী সব দেশেই এই ধরনের পথ চিহ্নের ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৮ নভেম্বর ভিয়েনায় হওয়া সম্মেলনে এই পথচিহ্ন সমূহের উপর বিস্তৃত আলোচনার পর কিছু সংশোধনী ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ভারতবর্ষে ১৯৮৮ সালের যান বাহন বিধিতে এই পথচিহ্নগুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়েচে। এই পথচিহ্নগুলি তিন ধরনের

(ক) বাধ্যতামূলক চিহ্ন (Mandatory road sign)

(খ) সতর্কীকরণ চিহ্ন (Cautionary road sign)

(গ) বিজ্ঞপ্তি বা সূচনাত্মক চিহ্ন (Informatory road sign)

বাধ্যতামূলক পথচিহ্ন

সাধারণত বাধ্যতামূলক চিহ্ন গোলাকৃতির হয়। অবশ্য দুটি চিহ্ন যথাক্রমে অষ্টভূজ এবং ত্রিভুজ আকৃতির। এই চিহ্ন বেশিরবাগ সময়েই লাল, যদিও কয়েকটি চিহ্নের রঙ নীল। এই চিহ্নের নির্দেশনা না মানলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়।

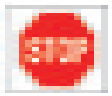
থামুন

রাস্তা দিন

প্রবেশ নিষধ

আসাক গাড়ীকে অগ্রাধিকার

গাড়ী নিষেধ

ট্রাক নিষেধ

গরু গাড়ী, ঠেলা নিষেধ

গরু গাড়ী নিষেধ

ঘোঁরা গাড়ী নিষেধ

ঠেলা নিষেধ

সাইকেল নিষেধ

পথচারী নিষেধ

ডানদিকে নিষেধ

বাঁদিকে নিষেধ

'ইউ'টার্ণ নয়

অতিক্রম নিষেধ

হর্ণ নিষিদ্ধ

সীমিত প্রস্থ

উচততা সীমিত

সীমিত দৈর্ঘ্য

সীমিত ভরের বাহন

সীমিত ধুরার বাহন

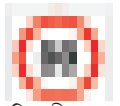
গতি সীমা

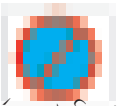
পার্ক করা নিষেধ

দাঁড়ানো নিষেধ

বাঁদিকে যাবেন

কেবল সামনের দিকে

ডানদিকে যাবেন

সামনে বা ডানদিকে

সামনে বা বাঁদিকে

বাঁদিকে ঘেঁষে চলুন

সাইকেল পথ

হর্ণ দিন

নিম্নতম গতি সীমা

বাধা নিষেধ সমাপ্ত

সতর্কতামূলক পথচিহ্ন

লাল ত্রিভুজ আকৃতির চিহ্ন রাস্তায় সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়।

রাস্তা ডানদিকে বেঁকা

রাস্তা বাঁদিকে বেঁকা

ডানদিকে হেয়ার পিন বেঁকা

বাঁদিকে হেয়ার পিন বেঁকা

ডানদিকে ঘুরে সামনে

বাঁদিকে ঘুরে সামনে এগোন

খাড়াই রাস্তা

ঢালু অবরোহন

সামনে সরু রাস্তা

সামনে চাওড়া রাস্তা

সরু সেতু

পিচ্ছিল রাস্তা

পাথুরে পথ

সাইকেল রাস্তা

পথচারীর রাস্তা

সামনে স্কুল

ট্রাফিক সংকেত

গবাদি পশু

ফেরী ঘাট

পাথর খসার আশঙ্কা

বিপজ্জনক বা নীচু রাস্তা

অসমান পথ

প্রতিবন্ধক গোট

সামনে কাজ চলিছে

বিভাজকে ফাঁক

চারটি পথের সংযোগস্থল

বাঁদিকে উপপথ

ডানদিকে উপপথ

y-আকারের সংযোগ স্থল

তিনটি পথের সংযোগস্থল

বিষম পথ সংযোগ

গোলাকার পথ সংযোগ

গেটযুক্ত রেল ক্রসিং

গেটবিহীন রেল ক্রসিং

ঘাট বা নদী তীর

ট্রাফিক সংকেত লাইট

সূচনামূলক পথচিহ্ন

চতুর্ভুজ আকৃতির পথচিহ্নগুলি পথে থাকা সুবিধা সমূহের সূচনা দেয়। সাধারণত এই চিহ্নগুলি নীল রঙের হয়।

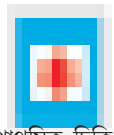
প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র

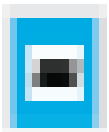
জলপান

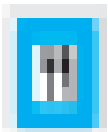
ভোজন স্থান

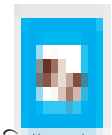
বিশ্রাম স্থান

সামনে রাস্তা বন্ধ

এইদিকে পার্ক করুণ

দুদিকে পার্ক করুণ

সাইকেল পার্কিং

ট্যাক্সি পার্কিং

পাবলিক টেলিফোন

পেট্রোল

হাসপাতাল

পথ রেখাঙ্কন (Road Marking) ঃ

গোলাকার সংযোগস্থল (Round About)

গোলাকার সংযোগস্থল (Round About) ঃ নীচে ছবিতে দেখানো ট্রাফিক দ্বীপ (island) কে কেন্দ্র করে চারপাশের পথ সংযোগ হ'লে স্থানটিকে গোলাকার সংযোগস্থল বলে। এই সংযোগস্থলে একাধিক লাইন বা সারি থাকলে নির্দিষ্ট লাইনে সাবধানে যাত্রা করতে হবে। ডানদিকে থাকা গাড়িকে অগ্রাধিকার দেওয়াই নিয়ম। সোজা রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় ঢোকা বা বেরোনোর সময় ইণ্ডিকেটর লাইট অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

জেব্রা ক্রসিং (Zebra Crossing) ঃ পথচারীদের রাস্তা পার হওয়ার জন্য রাস্তার কিছু অংশে জেব্রার পিঠের মত সাদাকালো রেখা আঁকা থাকে। এই রেখাতে পথচারী রাস্তা পার হতে থাকলে গাড়ি থামিয়ে পারাপার সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সাদা স্তব্ধ রেখা (White or Stop Line ঃ রাস্তার সংযোগ স্থান বা ট্রাফিক লাইটের কাছে এই ধরনের রেখা আঁকা থাকলে সেখানে গাড়ি থামানোর সময় রেখাটি স্পর্শ বা অতিক্রম না করে থামতে হবে।

সাদা স্তব্ধ রেখা এবং স্টপ লাইন

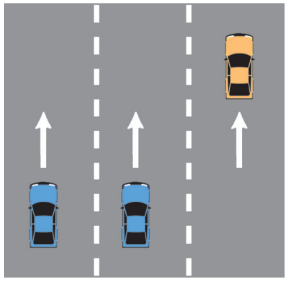

চওড়া ও একাধিক সারিযুক্ত রাস্তায় সাদা রেখাখণ্ডের সাহায্যে সারিগুলিকে পৃথক করা হয়। এই রেখাকে বিভাজক রেখা (Line separation) বলে। এই ধরনের রাস্তায় সারি পরিবর্তনের আগে অবশ্যই সংকেত দিতে হবে।

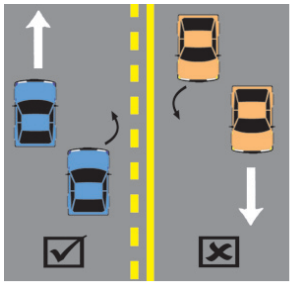

যদি খণ্ডিত রেখার পাশে একটি অখণ্ডিত রেখা থাকে তাহ'লে খণ্ডিত রেখার পাশে থাকা গাড়ি অন্য গাড়িকে

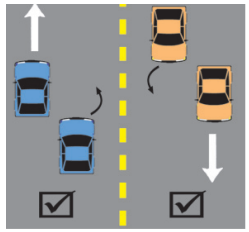

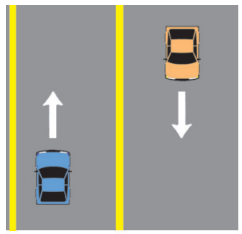

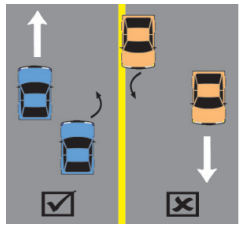

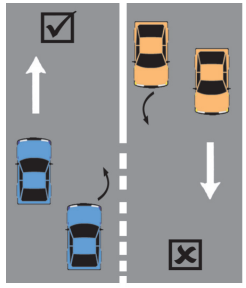

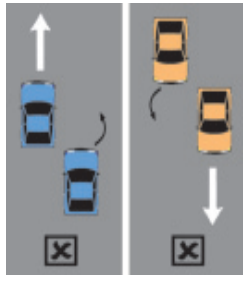

অতিক্রম করতে পারবে কিন্তু অখণ্ডিত রেখার পাশ দিয়ে যাওয়া গাড়ি অন্য গাড়িকে অতিক্রম করবে না।

যদি এই ধরনের খণ্ডিত রেখা দেখা যায় তাহ'লে সাবধানে এবং উচিত সংকেত প্রয়োগ করে তবেই অতিক্রম করা উচিত। রাস্তার একেবারে বাঁদিকের সীমায় হলুদ রঙের রেখা আঁকা থাকলে সেই অঞ্চলে সীমিত সময়ের জন্য (দীর্ঘক্ষণ নয়) গাড়ি থামানো যাবে। রাস্তায় হলুদ রঙের বিভাজক রেখা থাকলে কোনো গাড়ি একই দিকে যাওয়া অন্য গাড়িকে অতিক্রম করার সময় হলুদ রেখাটিকে কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না।

সাদা খণ্ডিত রেখা অখণ্ডিত রেখায় পরিবর্তিত হ'লে যতক্ষণ পর্যন্ত খণ্ডিত রেখা না দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য গাড়িকে অতিক্রম করা নিষেধ। রাস্তার মাঝ বরাবর অখণ্ড রেখা থাকলে সেই রাস্তায় অন্য গাড়িকে অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

প্রশ্নাবলি

১। পথ সুরক্ষা বললে কী বোজায়?

২। পথ সুরক্ষার ক্ষেত্রে চারটি 'E' অক্ষরের সাহায্যে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লেখ।

৩। হেলমেট কী এবং এটি ব্যবহার করা কেন প্রয়োজন সংক্ষেপে লেখ।

৪। সিট বেল্টের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সংক্ষেপে লেখ।

৫। ড্রাইভিং লাইসেন্স কী? কোন কোন শ্রেণীর যান-বাহনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেওয়া হয়?

৬। সুরাপান করে গাড়ি চলানোর ক্ষেত্রে যান-বাহন আইনে কী কী বিধি নিষেধ আছে সংক্ষেপে লেখ।

৭। স্কুল বাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পাঁচটি নিয়ম লেখ।

৮। পথচিহ্নগুলিকে কী কী ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে?

৯। পথ দুর্ঘটনা ঘটলে গাড়ি চালকের কী কর্তব্য?

১০। অপরিবহন বা ব্যক্তিগত গাড়িতে কী কী নথি রাখা প্রয়োজন?

১১। পথ দুর্ঘটনার মুখ্য কারণ কী কী?

১২। ২০১১ সনে শুরু হওয়া পথ সুরক্ষা কর্মসূচীর নাম কী ? এই প্রকল্পটির বিষয়ে সংক্ষেপে লেখ।

১৩। ভারতবর্ষে বলবৎ হওয়া পথ সুরক্ষা কর্মসূচী কবে প্রবর্তন হয়েছে?

১৪। পথ সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হ'লে গাড়ি চালানোর সময় কোন পাঁচটি নিয়ম মেনে চলা উচিত?

১৫। বিদেশে গাড়ি চালাতে হ'লে কোনো প্রবাসীকে কী করতে হবে?

Guarantee Certificate from the Publisher

Certified that this book is produced as per specifications of the Memorandum of Agreement (For publication of Text Books).

Clause No. 6.

Which states, interalia, that

Text Paper	=	70 GSM
Cover Paper	=	150 GSM
Size	=	1/8 Demy
Binding	=	Perfect
Cover Print	=	Multi Colour
Text Print	=	Multi Colour

If any of the specifications mentioned above, is violated than 'otherwise' the work order will be cancelled and the security money will be forgeited.

Name of the publisher

Assam Book Hive